দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকতেই তৃণমূল নেত্রীর এসআইআর বিরোধিতা — পৃঃ ১৩

রাজ্যে এসআইআর-এর প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব চলছে— পৃঃ ১৫

৭৮ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।। ১৯ মাঘ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प
अक्षय जल, सुरक्षित कल
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
जल गंगा संवर्धन अभियान
'जल की हर बूंद में आने वाले कल का भविष्य छिपा है। इसलिए इस अमूल्य धरोहर की किसी भी मूल्य पर रक्षा करना हमारा दायित्व है।'
- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
जल संरक्षण का 'जन संकल्प'
जल संचय में वृद्धि
₹2048 करोड़ लागत के 83 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण पूर्ण, जिससे खेत का पानी खेत में सिंचित होगा
₹254 करोड़ लागत से 1 लाख से अधिक कूप रीचार्ज
अमृत सरोवर 2.0 के तहत ₹ 354 करोड़ लागत से 1 हजार से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण
शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई एवं 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पूर्ण
जनभागीदारी
40 लाख लोगों की भागीदारी से 5 हजार से अधिक जल स्त्रोतों का हुआ जीर्णोद्धार
My Bharat पोर्टल के माध्यम से 2.30 लाख से अधिक जलदूत बनाए गए
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन
तकनीकी नवाचार
GIS आधारित SIPRI सॉफ्टवेयर के उपयोग से जल स्त्रोतों का चयन एवं AI आधारित मॉनिटरिंग की गई
नर्मदा परिक्रमा पथ एवं अन्य तीर्थ मार्गों के डिजिटलीकरण के जरिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा सकेगा ख्याल
पर्यावरणीय एवं कृषि प्रभाव
57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिह्नांकन एवं उनके शोधन के लिए योजना तैयार
जैव विविधता संरक्षण हेतु घड़ियाल और कछुओं का किया गया जलावतरण
145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों को चिन्हित कर हरित विकास हेतु योजना तैयार
अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5600 हेक्टेयर में पौधरोपण प्रारंभ
वन्य जीवों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम का निर्माण
पौधरोपण हेतु लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित
वॉटरशेड हेतु कार्य
₹1200 करोड़ लागत की 91 वॉटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत, 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा
9000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के जरिए किसानों को 1 वर्ष में दो से तीन फसलों का मिल रहा लाभ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ১৯ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২ ফেব্রুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

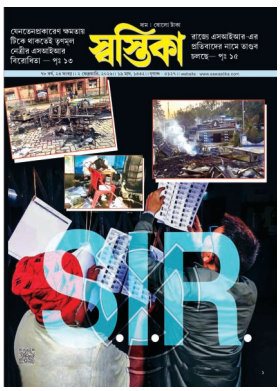

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের থেকে অধিক শক্তিশালী হলে তা অতীব বিপজ্জনক— তিনেমূল
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন ? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কতদিন পর্যন্ত মুখ লুকিয়ে থাকবে কংগ্রেস-সহ সেকু-মাকুরা ?
□ রমেশ শর্মা □ ৮

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংস অনিবার্য
□ কৌটিল্য □ ১০

'আইন আপনার, সিস্টেম আমাদের' পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর আড়ালে সাংবিধানিক বিপর্যয়
□ সাধান কুমার পাল □ ১১

যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকতেই তৃণমূলনেত্রীর এসআইআর বিরোধিতা □ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য □ ১৩

রাজ্যে এসআইআর-এর প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব চলছে
□ আনন্দ মোহন দাস □ ১৫

নৈরাজ্যের অবসানের দিন সমাগত, তাই কি এত ভয় ?
□ ড. বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৭

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ভিষগাচার্য জীবক
□ বিনয় কুমার মণ্ডল □ ৩১

কম্বোডিয়ার প্রিয়াবিহার শিবমন্দির
□ কৌশিক রায় □ ৩৪

কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা মরিচঝাঁপির গণহত্যা
□ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে : অনুপ্রবেশ, অরাজকতা ও সাংবিধানিক সংকট □ অরুণ কুমার চক্রবর্তী □ ৩৭

বসার অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ভারত
□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ৩৮

নেতাজীই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী □ কিশোর বর্মন □ ৪৩

বাংলাদেশের হিন্দু, হিন্দুর বাংলা দ্বেষ
□ প্রকাশ দাশ কশ্যপ □ ৪৮

কমিউনিস্টদের ভণ্ডামি ধরে ফেলেছে মানুষ
□ শ্যামলকান্তি মজুমদার □ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **সমাবেশ সমাচার : ২৩, ২৫, ২৮, ৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □

প্রকাশিত হবে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট - ২০২৬

একটানা নবমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট। রীতি মেনে ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হলো। কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ হলো আর কতটাই বা অপূর্ণ থেকে গেল তাই নিয়ে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করবেন কয়েকজন অর্থনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই নৈরাজ্যের অবসান কবে?

বঙ্গের স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপরতি মহারাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ জুড়িয়া এক অরাজকতার রাজত্ব চলিয়াছিল। ইতিহাস ইহাকে মাৎস্যন্যায় নামে অভিহিত করিয়াছে। অর্থাৎ কোনো কেন্দ্রীয় শাসন না থাকিবার কারণে চরম বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও দুঃশাসনের অভিশাপ বঙ্গজীবনকে গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু তাহা তো কোনো যোগ্য শাসক না থাকিবার কারণে সংঘটিত হইয়াছিল। বর্তমানে বঙ্গভূমিতে যে অরাজকতা চলিতেছে তাহা তো রাজ্যবাসীর দ্বারা নির্বাচিত শাসকের সৌজন্যেই। মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, ইহা কি সেই মাৎস্যন্যায় হইতে কম কিছু? পশ্চিমবঙ্গের এই অরাজকতার প্রারম্ভ অবশ্য সেই কমিউনিস্ট পরিচালিত বাম আমল হইতে। তাহারা দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর এই রাজ্যে অরাজকতার শাসন কায়েম করিয়াছিল। বিলম্বে হইলেও বাঙ্গালি তাহাদের বিদায় জানাইয়াছে। তাহাদের বিদায় জানাইয়া যে শাসকদল ক্ষমতা দখল করিয়াছে তাহারা বামেদের সেই লাল সন্ত্রাসকেও ম্লান করিয়া বঙ্গভূমিতে পুনরায় মাৎস্যন্যায়ের অবতারণা করিয়াছে। সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহারা দখলদারিত্ব কায়েম করিয়া লুঠতরাজের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। তাহাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা-মন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া অধস্তন আধিকারিক-সমূহ পর্যন্ত সকলেই নানাবিধ চৌর্যবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। রাজ্যের দরিদ্রদিগের কল্যাণার্থে বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত অর্থ পর্যন্ত ইহারা আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহার জন্য তাহাদের বহু নেতা-মন্ত্রীকে শ্রীঘর দর্শনও করিতে হইয়াছে। দেশজুড়িয়া এমনকী সমগ্র বিশ্বেও ইহার জন্য বর্তমান শাসকদলের সহিত বাঙ্গালিদের অপমান ভোগ করিতে হইতেছে। শাসকদলের তাহাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্ষমতার দম্ভে তাহারা অন্ধ হইয়াছে। এক প্রবীণ রাজনীতিবিদ এজন্যই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে বামেদের যোগ্য তথা শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই অপশাসনের বিরুদ্ধে যখন যখন রাজ্যবাসীর ক্ষোভ জাগ্রত হইয়াছে, ঠিক তখন তখনই একাংশের সম্মুখে দান-খয়রাতির গাজর ঝুলাইয়া সেই ক্ষোভ প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এই শাসকদল। যাঁহারা প্রতিবাদে মুখর হইয়াছেন তাঁহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছে নানাবিধ আক্রমণ। ইহার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার 'দুধেলগাই'দের ব্যবহার করিতেছেন। তাহারা রাজ্যের স্থানে স্থানে হিন্দুদের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ সংঘটিত করিতেছে। ফলে হিন্দুদের অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ পর্যন্ত করিতে হইতেছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইল, যিনি সংবিধানের শপথ গ্রহণ পূর্বক মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হইয়াছেন, তিনি পদে পদে অসাংবিধানিক কার্যে লিপ্ত হইতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে রাজ্যের জেহাদি সম্প্রদায়কে উসকাইয়া তিনি রাজ্যে জনজীবন স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় জেহাদিদের উসকাইয়া দিয়া রেল-সহ বহু কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট করিয়াছেন। ইদানীং নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে রাজ্যে যে বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধেও জেহাদিদের ব্যবহারপূর্বক সেই কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে রাজ্যের শাসকদল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতেই প্রতিপক্ষের নেতা-মন্ত্রী, সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক, এমনকী নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরাও জেহাদি আক্রমণের শিকার হইতেছেন। এহেন নৈরাজ্যের শাসন বাম আমলকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে।

কিঞ্চিৎ স্বস্তির বিষয় যে, শাসকের মদতে রাজ্যে এই অরাজকতার প্রতিবাদে মানুষ সংগঠিত হইতে শুরু করিয়াছে। রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া চলিতেছে। তাহাও প্রায় সমাপ্তির পথে। ইতিমধ্যেই প্রকাশ যে, অবৈধ ও ভুয়া ভোটারের শক্তিতেই বর্তমান শাসকদল নির্বাচনে বারংবার জয়লাভ করিতেছে, যাহা সম্পূর্ণ অনৈতিক। এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অবৈধ ও ভুয়া ভোটার বাদ পড়িবার আশঙ্কাতেই মুখ্যমন্ত্রী এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় নানা কৌশল ফাঁদিয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহল মনে করিতেছে, এই বিপুল পরিমাণ অবৈধ ও ভুয়া ভোটার বাদ দিয়া নির্বাচন হইলে এই নৈরাজ্যের অবসান হইতে পারে। অন্য একটি মহল মনে করিতেছে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমতাসীন রাখিয়া রাজ্যে নির্বাচন হইলে তাহা প্রহসন হইবে মাত্র এবং তাহাতে আগামীদিনে নৈরাজ্যের মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধির আশঙ্কা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় রাজ্যবাসীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরেই। তাহারা রাজ্য প্রশাসনের সহায়তায় অথবা কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া কীরূপে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবেন তাহার উপর নির্ভরশীল রহিয়াছে রাজ্যের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। রাজ্যের সজ্জনশক্তি সন্দেহাতীতভাবে মনে করিতেছেন যে, নির্বিঘ্নে, অধিকাধিক সংখ্যায় রাজ্যবাসী ভোটদান করিতে পারিলেই এহেন নৈরাজ্য ও অপশাসনের করাল হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে পশ্চিমবঙ্গ।

সুভাষিতম্

একং বিষরসো হন্তি শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।
সরাষ্ট্রং সপ্রজং হন্তি রাজানং মন্ত্রবিপ্লবঃ।। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব)

অর্থ ঃ বিষ কেবল একজন মানুষের প্রাণ হরণ করতে পারে। অস্ত্রের দ্বারা একজনকে হত্যা করা যায়। কিন্তু রাজার মন্ত্র (নীতি, পরামর্শ, কাজ) যদি দূষিত হয়ে যায়, তাহলে সমগ্র রাষ্ট্র তার প্রজা-সহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের থেকে অধিক শক্তিশালী হলে তা অতীব বিপজ্জনক

তিনেমূল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে রাজ্যের সরকার পালটানোর ভোটে সুবিধা করতে দেয়নি। ২০২৬-এর লড়াইয়ে বিজেপি ক্ষমতা দখল করবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১১-তে তৃণমূল সিপিএমকে হারায়। ২০১৬ সালে সিপিএম আর কংগ্রেসের ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফেরে তৃণমূল। ২০২১- এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তার আসন সংখ্যা ৯৬ শতাংশ (৩ থেকে ৭৭) বাড়িয়ে নেয়। ২০১৯ ও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১৮ ও ২০২৩-এর দু'টি পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যের সরকার পালটানোর ভোট ছিল না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীও তা বহুবার স্বীকার করেছেন। বিজেপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'পালটানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার'। এবারের ভোট বিজেপির কাছে মর্যাদার লড়াই। তৃণমূলের কাছে অস্তিত্ব রক্ষার। বিজেপি দেশের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আর তৃণমূল হলো একটি পরিবার-নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী। তৃণমূলকে কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট বলা হয়। অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি বা শাসক-বিরোধী ভোটের কবলে ইন্দিরা গান্ধী থেকে জ্যোতি বসু সবাই পড়েছেন। এবার তৃণমূলনেত্রীও পড়বেন। না হলে মানতে হবে যে, তিনি ম্যাজিক জানেন। তবে ক্ষয় কতটা হবে তা বলা কঠিন। এই প্রতিবেদকের ধারণা যে, অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সির ধাক্কায় প্রায় ২০-২২ শতাংশ ভোট হারাবে তৃণমূল। তৃণমূলের বড়ো ভোটব্যাংক হলো রাজ্যের মহিলাদের একাংশ ও মুসলমান সম্প্রদায়। 'সিএএ' ও 'ওয়াকফ আইন' কার্যকর হওয়ার পর রাজ্যে 'এসআইআর প্রক্রিয়া' চালু হওয়ায় তৃণমূলনেত্রীর ওপর মুসলমানদের আস্থা টলে গিয়েছে। তারা বুঝেছে যে, এরাজ্যে এসব চালু হতে দেবেন না বলে তাদের ভুল বুঝিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী।

এসআইআর-এর ধাক্কায় তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীও অনেকটাই কাবু। তাঁর প্রায় ২৭ শতাংশ মুসলমান এবং ২৩ শতাংশ মহিলা ভোট অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো রেউড়ি ভাতা নতুনভাবে চালু হয়নি। বাংলাদেশে মোল্লাবাদী জামাতের উত্থান এবং তৃণমূলনেত্রীর প্রতি তাদের সহানুভূতি এ রাজ্যের হিন্দু ঐক্যকে জোরদার করেছে। অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সিতে তৃণমূলের ভোট ভাঙলেও এর বিপ্রতীপে বিজেপির প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটে ভাঙন ধরা অসম্ভব। তা ১০ শতাংশ বাড়বে কিন্তু কমবে না। কয়েকটি সমীক্ষা বলছে, এবারের নির্বাচনে তৃণমূল যদি ২০ শতাংশের বেশি ভোট হারায়, তাতে বাম-কংগ্রেস আর কিছু খুচরো মুসলমান দল মিলে মোট প্রায় ১০ শতাংশ ভোট পাবে। তাতে বহু আসনে যদি তৃণমূল তিন নম্বরে চলে যায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ৩৪ বছরে সিপিএম কোনোদিন ৪০ শতাংশ ভোট পায়নি। তার চেয়ে অনেক কম ভোট পেয়ে তারা রাজ্যে ক্ষমতাসীন থেকেছে। ২০১১ সালে এ রাজ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট প্রায় সিপিএম। ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তারা পায় ২৭ শতাংশ ভোট। ক্ষমতা হারানোর পর ২০১৯-এর ভোটে তাদের ২০ শতাংশ ভোট সরে যায়। এই সময় রাজ্যে বিজেপির উত্থান লক্ষণীয়। এখন বিদেশি বামেরা ২৭ থেকে ৭ হয়ে মাত্র ৪ শতাংশে এসে ঠেকেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে তাদের জোটের প্রাপ্ত ভোট হলো প্রায় ১১ শতাংশ। বিদেশি বামেদের পতনের কথা তাদের নেতা প্রকাশ কারাত আগাম জানিয়েছিলেন। ২০২১-র ভোট জিততে তৃণমূল 'রাম আর বাম'-এর ভুয়ো তত্ত্ব প্রচার করলেও তা ধোপে টেকেনি। উলটে সেই ভোটে তারা বাম ও কংগ্রেসের থেকে যথাক্রমে ২৬ ও ২৯টি আসন ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নেয়। বাম-কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষয়ের বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায়— ২১৫।

এবারের ভোটের নিরিখে বেশ কিছু আসনে তৃণমূলের তৃতীয় স্থানে চলে যাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। রাজ্যপাটে আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এবারের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে যা হওয়ার নয় সেটাও হবে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে এবারের ভোটে ৫ শতাংশ ভোট স্যুইং করলে বিজেপি আর তৃণমূলের আসন সংখ্যার বিশাল ফারাক হবে। ২০২১-এর ভোটে তৃণমূল যে ৭৮টি আসনে ১০ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল, সেই আসনগুলি এবার বিজেপি জিতলে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। আবার যে ৫৯টি আসনে বিজেপি গতবার ১০ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল তা তৃণমূল জিতলে তাদের আসন সংখ্যা ২৫০ পার হয়ে যাবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এ রাজ্যের ৫৫টি বিধানসভা আসনে বিজেপি কখনও হারেনি। ফলে তৃণমূলের অপশাসনকালে ওই আসনগুলিতে বিজেপির হারার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। ইন্দিরা, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও তাদের রাজনৈতিক জীবনে অনেক কিছুই পারেননি। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করে সিপিএম। তখন ৩৫ শতাংশ ভোট দিয়ে শুরু করে পরে ৩৯-এ উঠে ২০১১ সালে ৩০ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৬ ও ২০২১-এ তৃণমূলনেত্রী উঠেছিলেন। ইতিহাস বলছে এবার তাঁর নামার পালা। কতটা নামবেন সেটাই দেখার। কোনো দল বা ব্যক্তি গণতন্ত্রের থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠলে তা মানুষের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। তাই আচার্য চাণক্য বলেছিলেন, প্রজার হিতের পরিবর্তে যে রাজা নিজের আর পরিবারের হিত দেখে সে বিষাক্ত হাত কেটে ফেলাই প্রয়োজন। এবারের নির্বাচনে রাজ্যের ভোটাররা কি তাই করবে?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

মমতাময়ীষু দিদি,

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের ময়নাগদী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হলো না। বেলডাঙার আলাউদ্দিন শেখকে খুন করা হয়নি তবু গোলমাল। পাপের সাজা শুরু হয়ে গিয়েছে। না দিদি, আপনাকে বলিনি। বাঙ্গালির পাপের সাজা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি না দিদি পতনের শব্দও শুনতে পাচ্ছি। আপনিও পাচ্ছেন নাকি!

আপনার পতনের শব্দ শোনা যাবে কিনা এখনও জানি না। তবে হিন্দু বাঙ্গালি যদি নিজের পতন রুখতে চায় তবে আপনার পতনটাই চাই। হ্যাঁ, দিদি কোনো ভয় না রেখেই আমি এই কথাটা বললাম। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের ময়নাগদী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হলো না। পশ্চিমবঙ্গ এখন কি বাংলাদেশে পরিণত হয়ে গেছে দিদি?

অন্য কোনো পূজা, রামনবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে হলে এমন প্রশ্ন করতাম না দিদি। প্রশ্নটা উঠেই যায় যখন স্কুলের ছোটো ছোটো ছাত্র-ছাত্রীরা সরস্বতীপূজা করতে চাইলে স্কুল কর্তৃপক্ষ আর আপনার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে সেই পূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ দেখানো হয়, স্কুলে হিন্দু বাচ্চারা সংখ্যালঘু, ৫০ শতাংশের উপর মুসলমান ছোটো বাচ্চা রয়েছে, তাই সরস্বতী পূজা করতে দেওয়া হবে না। অবশেষে সেই পূজা করতে হলো রাস্তার ধারে ফুটপাথে। তাতেও কম বাধা আসেনি। স্কুলে শিক্ষক নেই, ঘর নেই, লেখাপড়া নেই, শিক্ষকের চাকরি নেই, অযোগ্য বলে শিক্ষকদের প্রতি বাচ্চাদের সম্মান নেই। অনেক নেই ছিল, এবারে স্কুলে মা সরস্বতীরও স্থান নেই। বিদ্যার দেবী পূজিতা হলেন উপেক্ষিতা হিসেবে!

বেলডাঙার আলাউদ্দিন শেখকেও তো খুন করা হয়নি। প্রাথমিক তদন্ত শেষে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতিয়ার করে সেটা যেদিন জানিয়ে দিল ঝাড়খণ্ড পুলিশ আমার না নিজের চোখ, কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না দিদি। কী লেখা আছে নয়নাতদন্ত রিপোর্টে? লেখা রয়েছে, 'Cause of death : Antemortem hanging'। মানে, জীবিত অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়াতেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলার বিশ্রামপুর থানা এলাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন আলাউদ্দিন। ভাঙাচোরা বাসনপত্রের বদলে, স্টিল ও হিন্ডোলিয়ামের বাসনপত্র ফেরি করতেন সাইকেল নিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি। গত ২২ জানুয়ারি, ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু তাঁর বাড়িতে মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই, কে বা কারা, রটিয়ে দেয়, 'ভিন রাজ্যে ফের বাঙ্গালি পরিযায়ীর ওপর হামলা। আলাউদ্দিনকে পিটিয়ে মেরে, তারপর তাঁর নিথর দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।' এরপর বেলডাঙ্গায় জুম্মাবার কী কী ঘটে, আপনি দিদি সবাই জানেন। অথচ, পালামৌ জেলার পুলিশ সুপার শ্রীমতী রেশমা রমেশ যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তাতে জানা যাচ্ছে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, কোনো ব্যক্তিগত কারণেই আলাউদ্দিন আত্মহত্যা করেন। আলাউদ্দিনের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেহে কোনো আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায়নি। পরে মুর্শিদাবাদ পুলিশের পক্ষে বেলডাঙা থানাও একটি তদন্ত দল পাঠায় ঝাড়খণ্ডে। সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতে তৈরি হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে সকলেই বলছেন, বাঙ্গালি বলে কেন কোনো কারণেই মারধরের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

> বেলডাঙায় মহিলা সাংবাদিককেও নিগ্রহ করা হলো। আর আপনি বললেন, জুম্মার মবের মধ্যে ঢুকতে কে বলেছিল! যেন, মারধর করাটাই দস্তুর।

দিদি, ঝাড়খণ্ডে তো বিজেপি ক্ষমতায় নেই। প্রধান বিরোধী দল। তাতেই এই। কিন্তু দিদি, যদি একই ঘটনা বিজেপি শাসিত রাজ্যে হতো তাহলে কী কী করতেন! বেলডাঙায় মহিলা সাংবাদিককেও নিগ্রহ করা হলো। আর আপনি বললেন, জুম্মার মবের মধ্যে ঢুকতে কে বলেছিল! যেন, মারধর করাটাই দস্তুর।

আচ্ছা, রাজ্যে কি বড়ো রকমের হিন্দু-মুসলমান গোলমাল তৈরির ছক চলছে। কারণ? এবার আপনার লোকেরই বলছেন, আর দুধেল গাই ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ণ নেই। আমার প্রশ্ন, আলাউদ্দিনকে পিটিয়ে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়ার খবর তাহলে কে বা কারা রটালেন? কী উদ্দেশ্য নিয়ে ওই খবর রটানো হয়েছিল? একটু বলবেন কি!

অবরোধ তুলতে, দাবি মেনে, আলাউদ্দিনের পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয় মুর্শিদাবাদ প্রশাসন। আলাউদ্দিনের মতো একজন গরিব মানুষের পরিবারের কেউ চাকরি পেলে ভালো। কিন্তু আলাউদ্দিনকে ঝাড়খণ্ডে কাজের জন্য কেন যেতে হয়েছিল! কোন অভাবে! কেন আত্মহত্যা! নিজের গ্রামে স্বজনদের সঙ্গে থাকতে পারলে কি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতেন আলাউদ্দিন! জবাবটা দেবেন নাকি দিদি!

বারাসতের স্কুল কিংবা বেলডাঙার ঘটনা কিন্তু শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানদের জন্যও পাপের সাজা। অন্যায় সহ্য করাও যে মহাপাপ। □

অতিথি কলম

রমেশ শর্মা

কতদিন পর্যন্ত মুখ লুকিয়ে থাকবে কংগ্রেস-সহ সেকু-মাকুরা ?

জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও নৃশংস হত্যার ঘটনা থামার কোনো নাম নেই। এখন তার ওপর যুক্ত হয়েছে হিন্দু মহিলাদের ওপর অমানবীয় সম্মিলিত বলাৎকারের অধ্যায়। আশ্চর্যজনকভাবে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি যারা সন্ত্রাসবাদীদের মানবাধিকারের দোহাই পেড়ে থাকে তারা একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করে বসে আছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এবং কে বেণুগোপালকে যখন বাংলাদেশে হিন্দুদের আক্রমণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে যান।

এটা সেই বাংলাদেশ যেখানকার মানুষ একসময় বঙ্গসংস্কৃতিকে নিয়ে গর্ব করতেন। এই সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য তাঁরা দীর্ঘদিন লড়াই করেছেন। তাদের লড়াইকে সার্থক করার জন্য ভারত পূর্ণ শক্তিতে সহযোগিতা করেছে। তাদের জন্য ১৯৭১ সালে যুদ্ধও করেছে। তাতে ৩৯০০ ভারতীয় সেনাকে প্রাণ বলিদান দিতে হয়েছে এবং ১০ হাজার সেনা আহত হয়েছে। কয়েক কোটি টাকার আর্থিক চাপ সামাল দিতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ভারতের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আজ সেই বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে করছে আর নৃশংসভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে চলেছে।

ক্ষমতা পরিবর্তনের দেড় বছরপর বাংলাদেশ এখন যে রাস্তায় চলছে তাতে তিনটি বিষয় পরিষ্কার। এক, তাদের পাকিস্তানের প্রতি প্রেম ও ঘনিষ্ঠতা; দুই, ভারতের প্রতি ঘৃণা এবং তিন, হিন্দুদের ওপর নানাবিধ আক্রমণ ও হত্যা। এই তিনটি বিষয়েই অগ্রাধিকার দিয়েছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং জেহাদি সংগঠন জামাত-এ-ইসলাম। জামাত-এ-ইসলাম কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। বহু দেশে এটি নিষিদ্ধ। আইএসআই সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে বিতাড়ন করা এই দুটি সংগঠনের রণনীতি ছিল। ওটা তো লোক দেখানোর ছাত্র আন্দোলন ছিল, আসলে তাদের পেছনে সক্রিয় ছিল এই দুটি সংগঠন। এজন্যই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. ইউনুস এদেরই ইশারায় নেচে চলেছে। এখন আইএসআই বাংলাদেশে অফিস খুলে বসেছে, আর জামাত-এ-ইসলামি প্রকাশ্যে নির্বাচনে লড়ছে। এটি সেই জামাত-এ-ইসলামি যারা ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রমের বিরোধিতা করেছিল। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। এদের সক্রিয়তায় এখন বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে ভিসার নিয়ম সরল করা হয়েছে এবং সরাসরি বিমান চলাচলও শুরু হতে চলেছে।

বাংলাদেশ এখন প্রকাশ্যে ভারতকে হুমকি দিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে আলাদা করার হুমকি দিচ্ছে। অবরপ্রাপ্ত এই সেনা আধিকারিক ভারতেকে টুকরো টুকরো করে ফেলার কথা বলছে। হুমকি হালকাভাবে নেওয়া যেতে পারে না। এই সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের 'স্লিপার সেল' রূপে ভারতে বসানোর ষড়যন্ত্র করে চলেছে আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ এবং তাদের হত্যা করে চলেছে। জেহাদিদের এই নৃশংসতা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ঘটনার বাড়বাড়ন্ত খুবই উদ্বেগজনক। বাংলাদেশের তথ্য অনুসারে হিন্দুদের ওপর এখন পর্যন্ত তিনহাজারেরও বেশি হামলা হয়েছে। ভারত সরকারের তথ্য অনুসারে গত ২৬ ডিসেম্বরে এই সংখ্যা ছিল ২৯০০। এছাড়াও জেহাদিরা ১৩০টির বেশি মন্দির ধ্বংস করেছে। এসব বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য। প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি।

বহু ঘটনার অভিযোগ তো পুলিশের কাছে পৌঁছায় না আর পুলিশ অভিযোগ গ্রহণও করে না। তাই সঠিক সংখ্যা কারও কাছে নেই। বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে হিন্দুদের ওপর হামলা হয়নি। সরকার এসব ঘটনার সম্প্রচারে নিষেধজ্ঞা জারি করেছে। সংবাদপত্র তো বন্ধ করেই দিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়াগুলির অ্যাকাউন্টও ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। তাসত্ত্বেও বহু খবর প্রকৃত তথ্যকে সামনে আনছে।

জেহাদিরা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করছে। জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালানো, মন্দির ধ্বংস, মহিলাদের ওপর বলাৎকার, ছুরি মেরে হত্যা, গুলি করে হত্যার পর এখন আগুনে পুড়িয়ে মারার মতো নৃসংশতা শুরু হয়েছে। এই নৃশংসতা ইসলামি শাসনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তখন এভাবেই হিন্দুদের হত্যা নরসংহার করে, তাদের মনে ভয় সৃষ্টি করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হতো। গত দু'মাসে আক্রমণ ও হত্যাগুলিতে ওই মধ্যযুগীয় বর্বরতারই পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

হিন্দুদের ওপর নৃশংস আক্রমণ, উৎপীড়ন ও হত্যার এই নতুন রূপ আরও বেড়েছে জেহাদি ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর। ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগরে দুই মোটর সাইকেল আরোহী হাদিকে গুলি করে হত্যা করে। ১৮ ডিসেম্বর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়। হাদির মৃত্যুর সঙ্গে হিন্দুদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবু এই অজুহাতে হিন্দুদের বাড়িঘর, ব্যবসা, সংবাদপত্রের অফিস (ডেইলি স্টার, প্রথম আলো), সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ছায়ানট, উদীচী) প্রভৃতির ওপর আক্রমণ চালানো হয়।

গত ১৮ ডিসেম্বর দীপুচন্দ্র দাসের সঙ্গে যে নৃশংসতা হয়েছে তা সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। জেহাদিরা তাকে উলঙ্গ করে, মেরে আধমরা করে, গাছে ঝুলিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। হিন্দুদের মনে ভীতি সৃষ্টির জন্য এই ঘটনার ভিডিয়ো করে তা সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল করা হয়েছে। তারপর ২৪ ডিসেম্বর অমৃত মণ্ডল নামে এক হিন্দু যুবককে ইসলাম অবমাননার নাম করে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। তারপর ৩০ ডিসেম্বর ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস নামে আর এক হিন্দুকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে জেহাদিরা। এর পরের দিন খোকনচন্দ্র দাস নামে এর হিন্দু ব্যবসায়ীকে তিনি যখন তাঁর দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন তখন তার গায়ে পেট্রল ঢেলে দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। এরপর এবছরের ৫ জানুয়ারি যশোরের সাংবাদিক রাণাপ্রতাপ বৈরাগীকে ভরা দুপুরে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। এইদিনই আর এক ব্যবসায়ীকে টাকাপয়সা লেন-দেনের অজুহাতে হত্যা করে। বাংলাদেশের পরিবেশ কতটা বিষাক্ত হয়ে গেছে, এই ঘটানগুলিতেই এর অনুমান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানোর জন্য রোজ নতুন নতুন পদ্ধতি বের করা হচ্ছে। নিষ্ঠুরতম হত্যার ধারাবাহিকতায় এরকম আরও দু'টি ক্রম যুক্ত হয়েছে। জেহাদিরা হিন্দুদের আতঙ্কিত করার জন্য কেবল তাদের সামাজিক জীবনেই চাপ সৃষ্টি করছে না, প্রশাসনিক মহলে কর্মরত হিন্দুদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জের নাদিপাড়া এলাকার এক হিন্দু বিধবাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। তারপর জেহাদিরা সেই বিধবাকে গাছে বেঁধে তার চুল কেটে ফেলেছে। এই ঘটনারও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা কুরিগ্রাম-৩ বিধানসভা এলাকার। এখানকার জামাত-এ-ইসলামি প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী নির্বাচনে লড়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা করেন। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনেরও নাগরিক। দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। তখন সালেহী ডেপুটি কমিশনার অন্নপূর্ণা দেবনাথের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। হিন্দু হওয়ার কারণে সালেহীর সমর্থকরা শ্রীমতীদেবনাথের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিতে থাকে। এই ঘটনাও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়। বাংলাদেশে এই ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হওয়ার কথা, আর সেজন্য জেহাদিরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে।

ভারতের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং তাদের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের 'মানবাধিকারের প্রহরী' রূপে ঘোষণা করেছে। সন্ত্রাসবাদী, দাঙ্গাকারী, জেহাদি, এমনকী হামাসের মতো সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিও এদের সমবেদনা উথলে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, হিন্দু নারীদের বলাৎকার, হিন্দুদের নৃশংস হত্যা— কোনো কিছুতেই এদের সংবেদনা জাগ্রত হয় না। তখন তাঁরা নীরবতা পালন করে থাকেন। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়ে কংগ্রেস চিরকাল নীরবতা পালন করে এসেছে। এটাই ইতিহাস। স্বাধীনতার আগে মোপলা মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু নরসংহার, চট্টগ্রাম-ঢাকা, করাচী-পেশোয়ার, ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে কলকাতা- নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর যেকোনো অত্যাচারের বিষয়ে কংগ্রেসে-সহ সেকু-মাকুরা একেবারে নীরব। এখন তো এদের নেতাদের সামনে এরকম বিষয় এলে তারা মুখ লুকিয়ে ফেলেন অথবা দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন। এরকম ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দুদের বিষয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে জয়রাম রমেশ এবং কে বেণুগোপাল উঠে পালিয়ে গেছেন।

অন্যদিকে, দিল্লি দাঙ্গার প্রধান অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শরজিল ইমামের সুপ্রিম কোর্টে জামিন মঞ্জুর না হলে কংগ্রেসেরই দুই নেতা ইমরান মাসুদ ও রসিদ আলভি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওপর প্রশ্ন তোলেন এবং সেই রায়কে অমানবিক বলেন। এই রসিদ আলভি বাংলাদেশের বিতাড়িত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়াকে অনুচিত বলেছিলেন। এতে নাকি সারা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। ইসলামি বা ইংরেজ শাসনে এদের ভয়ের বিষয়টি বোঝা যায়, কিন্তু স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও তারা কার জন্য মুখ লুকিয়ে থাকছেন?

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

শোক সংবাদ

মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর খণ্ডের কোনার গ্রামের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ষষ্ঠী কুমার দাস গত ২২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

শিলিগুড়ি দীনেশ নগরের স্বয়ংসেবক অসিত ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী শ্রীমতী উমা ভট্টচার্য গত ৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ২ কন্যা ও ২ নাতনিকে রেখে গেছেন।

* * *

শিলিগুড়ি দীনেশ নগরের স্বয়ংসেবক তথা সেবক রোড সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রধান আচার্য নির্ভয়কান্তি ঘোষের মাতৃদেবী গত ১৮ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংস অনিবার্য

২০২৩-এর রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা ২৬টি ধাপে ভোট লুঠের সাক্ষী থাকে রাজ্যবাসী। একটি ধাপে আটকে গেলে পরের ধাপ ব্যবহার করে তারা। কিন্তু এর মধ্যেও তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধী ও হার্মাদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় গ্রামের মানুষজন। ফলে কিছু আসনে তারা সফল হতে পারেনি। যে ভয়াবহ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ গণতন্ত্রের উৎসব পঞ্চায়েত নির্বাচনকে তারা প্রহসনে পরিণত করে তার ধাপগুলি ছিল ঠিক কীরকম?

(১) প্রথমে এক মাস ধরে রাজ্যব্যাপী ভোট লুঠের প্রশিক্ষণ। (২) অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক রাজীব সিনহাকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বেছে নেওয়া। (৩) গোটা রাজ্যে একদিনে পঞ্চায়েত ভোট করার সিদ্ধান্ত। (৪) কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন না করার সিদ্ধান্ত। (৫) বিরোধী দলের প্রার্থীদের নমিনেশন বা মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা। (৬) কোনোরকমে জমা দিতে পারলেও নমিনেশন তুলে নেওয়ার জন্য চাপ। (৭) কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রুখতে আদালতে যাওয়া। (৮) বিরোধী দলের প্রচারে বাধা। (৯) বিরোধী দলের প্রার্থীদের বাড়ির সামনে সাদা থান ফেলে আসা। (১০) এতকিছু সত্ত্বেও ভয় না পেলে বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থকদের হত্যা; তাঁদের পরিবার- পরিজনদের ওপর আক্রমণ। (১১) ভোটের দিন বিরোধী দলের ভোটারদের বাড়ি থেকে না বেরোনোর নির্দেশ। (১২) কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা; তাদের নির্বাচনের কাজে ব্যবহার না করা। (১৩) হাল খারাপ বুঝলে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থকদের জখম করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। (১৪) ভোটের দিন সকালে বোমা ছুঁড়ে ভোটারদের আতঙ্কিত করা। (১৫) বুথ দখল করে ছাপ্পাভোট। (১৬) বিরোধী দলের বুথ এজেন্টকে অপহরণ। (১৭) নকল ব্যালট ছাপিয়ে এনে ব্যালটবাক্স ভেঙে সব ব্যালট পালটে দেওয়া। (১৮) ভোটকর্মীদের ভয় দেখিয়ে নকল ব্যালটে সই করানো। (১৯) গণনার সময় বিরোধী এজেন্টকে মারধোর করে তাড়িয়ে দেওয়া। (২০) অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলে ব্যালট খেয়ে নেওয়া। (২১) বেশি ভোটের ব্যবধানে হারলে বিরোধী দলের জয়ী প্রার্থীকে অপহরণ করে তিনি পরাজিত বলে সই করিয়ে নেওয়া। (২২) সেটাও না পারলে জয়ী প্রার্থীর ছেলেমেয়েদের অপহরণ করে ব্ল্যাকমেল করিয়ে প্রার্থীকে দল বদল করতে বাধ্য করা। (২৩) আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে তৃণমূল কর্মী তথা অস্থায়ী কর্মী ও সিভিক পুলিশকে ভোটের কাজে ব্যবহার। (২৪) নির্বাচন পর্ব ও ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে প্রায় ৪০ জন সাধারণ মানুষের বলিদান। (২৫) 'প্রহসন'-এর শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ সন্ত্রাসের জোরে দখল করে বাঙ্গালিকে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন এবং পিসিমণিকে কন্যাশ্রী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে দলীয় ট্যুইট। (২৬) ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস পর্বে প্রায় এক মাস ধরে বিরোধীদের ঘর ভাঙা, অগ্নিসংযোগ, বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থকদের বাড়িছাড়া করা, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া এবং সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে সত্যকে চেপে রাখা।

২০২১-এর বিধানসভা ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস পর্বে রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থকদের মানবাধিকার শাসক দলের হার্মাদ বাহিনীর দ্বারা এমনভাবে পদদলিত হয় যে, এই সংক্রান্ত মামলায় তাদের পর্যবেক্ষণে কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, এ রাজ্যে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন রয়েছে। এমতাবস্থায় দেশব্যাপী ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই পশ্চিমবঙ্গে তা রুখতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে দেশের বাকি সব বিরোধী দল অন্যান্য রাজ্যে সম্পূর্ণ সহায়তা করলেও এ রাজ্যে সেটা মেনে নিতে পারেনি তৃণমূল। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। এরপর এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে তারা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে বারবার। এর সঙ্গে চলছে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের ব্যবহার করে ব্যাপত অন্তর্ঘাত, নাশকতা, দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে বিএলও-দের ভয় দেখানো, হুমকি, এমনকী বিএলও-দের গায়ে হাত তোলার কাজ। তাদের এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে সমর্থন করতে মাঠে নেমেছে সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিভিন্ন বামপন্থী ও অতিবামপন্থী দলগুলি। অমর্ত্য সেন-সহ বহু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত এই অন্যায়কে সমর্থন করতে আসরে নেমেছেন। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দল রাজ্যের শাসক দলের এই অন্যায়ের শরিক হয়ে রাজ্যবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার খেলায় শামিল হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দুদের বেঁচে থাকার এবং বঙ্গভূমি রক্ষার শেষ লড়াই। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর দক্ষিণ ভারতে মুসলিম লিগ টিকে থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে তারা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্লিপার সেল হিসেবে ঢুকে গিয়ে রাজ্য সরকারি নীতি নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, যার পরিণামে ৭৮ বছর ধরে সর্বস্ব হারাতে থাকে হিন্দু বাঙ্গালি। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়, কিন্তু এই সংস্কার থেকে বাদ থাকে মুসলমান জমিদার। ভূমি সংস্কার হলেও বাদ থাকে মুসলমান জমি মালিক। রাজ্যের সব শিল্প বন্ধ হলেও বাদ থাকে চর্মনগরী। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাজ্যের কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি-সহ সব ব্যবসার সাপ্লাই চেন থেকে মূল ব্যবসাবাণিজ্য হিন্দুদের হাতের বাইরে। ফলে বাঙ্গালি হিন্দু আজ পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হোক বা একজন কৃষক— জীবন-জীবিকার জন্য সকলেই এখন ঘরছাড়া। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মুসলিম লিগের স্বপ্ন আজ সফল হওয়ার পথে। পূর্ববঙ্গ দখলের পর বঙ্গভূমির অবশিষ্টাংশ তারা দখলের পথে। গত একমাস ধরে ফরাক্কা, চাকুলিয়া, বেলডাঙ্গা, সমুদ্রগড়ে সামনে এসেছে জেহাদি সন্ত্রাস। লক্ষ্য হলো রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া ভেস্তে দেওয়া। একাধিক স্থানে রাজ্যের শাসক দলের বিধায়কদের নেতৃত্বে বিডিও অফিস ভাঙচুর হলেও পুলিশ অবতীর্ণ হয়েছে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়। অসংখ্য ৬ ও ৭ নং ফর্ম জ্বালিয়ে দেওয়া হলেও জেহাদিদের বিরুদ্ধে নির্লিপ্ত থেকেছে রাজ্য পুলিশ-প্রশাসন। এই প্রতিবেদন লেখার সময় হাওড়া জেলার শ্যামপুর-২ ব্লকের খাড়ুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের বৈঁচি গ্রামে স্থানীয় হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ নেমে এসেছে বলে সংবাদসূত্রের খবর। রাজ্যজুড়ে সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়ার দরুন সর্বাগ্রে চাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তৈরি করতে হবে বাঙ্গালির স্বপ্নের 'সোনার বাঙ্গলা'। তবে এই লড়াইয়ে আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও বিচারবিভাগ-সহ অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। না হলে এই লড়াইয়ে সফল হওয়া অসম্ভব! □

‘আইন আপনার, সিস্টেম আমাদের’

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর আড়ালে সাংবিধানিক বিপর্যয়

সাধান কুমার পাল

পশ্চিমবঙ্গে চলমান ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পুনর্নিরীক্ষণ (এসআইআর) প্রক্রিয়া আজ নির্বাচন কমিশনের কাছে এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে— যেখানে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে শুধুমাত্র একটি এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই নির্বাচন কমিশনকে এত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেখানে আদৌ কি পশ্চিমবঙ্গে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা সম্ভব?

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-র তালিকা প্রকাশের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এক তৃণমূল নেতার প্রকাশ্য মন্তব্য— ‘জ্ঞানেশ কুমার আপনি আইনের কথা বলবেন, আর আমরা চালাবো পুরো সিস্টেম’— এই সংকটের মূল স্বরূপকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে দেয়। এই বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, এরাজ্যে এসআইআর ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতার বড়ো অংশই ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তর্ঘাতের ফল।

একদিকে অনুগত বিএলওদের দিয়ে তথাকথিত ‘ক্ল্যারিক্যাল মিসটেক’ করিয়ে ভোটার তালিকায় ইচ্ছাকৃত অসঙ্গতি তৈরি করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি জন্ম নেয়। অন্যদিকে সেই ক্ষুব্ধ জনতাকেই ব্যবহার করে বিএলওদের বাড়ি ঘেরাও, কর্মস্থলে হেনস্থা, এমনকী ভীত-সন্ত্রস্ত বিএলওদের দিয়ে মিছিল-মিটিং করানো হয়েছে। কোথাও গণইস্তফার নাটক মঞ্চস্থ করে, কোথাও বিডিও অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসঙ্গে ‘নির্বাচন কমিশন বিজেপির নির্দেশে চলছে’— এই ন্যারেটিভ ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের মনে সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা তৈরির সুপরিকল্পিত চেষ্টা চালানো হয়েছে। এমনকী সাধারণ মৃত্যুকেও এসআইআর-এর তথাকথিত আতঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কাল্পনিক ও ভুয়ো কাহিনি ছড়িয়ে রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি করাই যেন এখন পশ্চিমবঙ্গের পরিচিত চিত্র।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-বিরোধিতার নামে যা চলছে, তা নিছক রাজনৈতিক লড়াই নয়— এটি ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ডিপ স্টেটের এক অঘোষিত যুদ্ধ, যার অন্যতম রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ।

এই নিবন্ধ রচিত হওয়ার সময়ে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গত ২৪ জানুয়ারি তাদের ওয়েবসাইটে প্রায় দেড় কোটি ভোটারের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ হলো ‘আনম্যাপড্ ভোটার’ যারা ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হওয়া এসআইআর তালিকার সঙ্গে প্রজেনি ম্যাপিং করতে পারেননি। বাকি ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটার লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির আওতায় রয়েছেন। সেই তালিকা প্রকাশের পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা বলা কঠিন।

ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় যৌক্তিক অসঙ্গতির বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়েছে। কোথাও শুনানির নোটিশ পেয়ে ক্ষিপ্ত জনতা বিএলওদের ঘিরে ধরছে, তাদের বাড়ি ঘেরাও করছে; কোথাও আবার বিডিও অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চলছে। বিভিন্ন জায়গায় মিছিল থেকে শোনা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর স্লোগান— ‘জ্ঞানেশ কুমারের চামড়া তুলে দেবো আমরা।’ একাধিক স্থানে বিএলওদের গণইস্তফার ঘটনাও সামনে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের যুবরাজ প্রায় প্রতিটি সভায় খসড়া ‘ভোটার তালিকায়’ মৃত দেখানোর অভিযোগ তুলে কিছু মানুষকে র‍্যাম্পে হাটিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জনতাকে উসকে দিচ্ছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও এসআইআর-এর কারণে মানুষের মৃত্যুর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা করার হুমকি দিয়েছেন।

খসড়া তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও নিখোঁজ— মোট ৫৮ লক্ষ নাম

বাদ পড়ার পর প্রথম দফায় কমিশন ধাপে ধাপে ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪২৬ জনকে শুনানির জন্য ডাকে। এরা ২০০২ সালের এসআইআর তালিকার সঙ্গে কমিশন নির্ধারিত পারিবারিক সম্পর্কের যোগসূত্র দেখাতে পারেনি। গত ২১ জানুয়ারি এই প্রায় ৩২ লক্ষের শুনানি শেষে দেখা যায়, গড়ে মাত্র তিন লক্ষের কিছু বেশি মানুষ হাজির হয়েছেন। এই তিন লক্ষের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কিনা, তা নিয়েও গভীর সংশয় তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় এত ব্যাপক অসঙ্গতি কীভাবে তৈরি হলো? ভোটার তালিকা আকাশ থেকে পড়ে না। নির্বাচন কমিশনের নামে কাজ করা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের হাত দিয়েই এই তালিকা তৈরি হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের প্রতি ভয় কিংবা ভক্তি— যাই হোক না কেন, সেই একই সরকারি কর্মচারীদের হাতেই এই বিপুল অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে। এখন আবার সেই কর্মচারীদের হাত দিয়েই অসঙ্গতি দূর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আশঙ্কা থেকেই যায়— এইবারও কি ভয় ও ভক্তি সমানতালে কাজ করবে না? বিশেষ করে বিএলওদের তথাকথিত ক্ল্যারিক্যাল মিসটেক থেকে জন্ম নেওয়া যৌক্তিক অসঙ্গতিগুলির পৃথক ও স্বাধীন তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মানুষকে খেপিয়ে তোলার এই ভয়ঙ্কর চক্রান্তের আসল রূপ কখনোই সামনে আসবে না।

ভারতের নির্বাচন কমিশন গত ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার-অভিভাবক ম্যাপিঙে এমন কিছু 'বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব' অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, যা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। সাতটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মতো একক পিতা-মাতার সঙ্গে একশোরও বেশি ভোটার যুক্ত। কোথাও দাদু-দিদার বয়স ৪০ বছরের কম, কোথাও ভোটারের নাম আগের এসআইআর তালিকার সঙ্গে মেলে না, আবার কোথাও ভোটার ও পিতা-মাতার বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম কিংবা ৫০ বছরের বেশি।

আদালতকে কমিশন জানিয়েছে, একক পিতা-মাতার সঙ্গে পাঁচটির বেশি সন্তানের ৪ লক্ষ ৫৯ হাজারেরও বেশি ঘটনা, ছ'টির বেশি সন্তানের ২ লক্ষের বেশি ঘটনা, এমনকী কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশেরও বেশি সন্তানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ঘটনাও চিহ্নিত হয়েছে। একটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন একক নির্বাচকের সঙ্গে ৩৮৯ জন ভোটার যুক্ত থাকার নজিরও সামনে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট বক্তব্য— এই ধরনের ম্যাপিংকে বৈধ ধরা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব এবং প্রতারণামূলক ম্যাপিঙের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে গভীর তদন্ত অপরিহার্য।

এই প্রেক্ষাপটেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে হাজির হয় নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের যুক্তি, এসআইআর আদেশ নাকি স্বেচ্ছাচারী ও অসাংবিধানিক এবং এতে প্রকৃত ভোটাররা বাদ পড়বেন। এর জবাবে কমিশন হলফনামায় জানায়, তাদের প্রযুক্তিগত যাচাই-বাছাই ব্যবস্থা সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্যেই কাজ করছে। 'যৌক্তিক অসঙ্গতি' মানেই কারুর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নয়; বরং নির্ধারিত নথির মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্যতা ও নাগরিকত্ব প্রমাণের সুযোগ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চলাকালীন যাদের বিরুদ্ধে 'যৌক্তিক অসঙ্গতি' উত্থাপিত হয়েছে, সেই অন্তত ১.২৫ কোটি মানুষের নাম প্রকাশ করতে হবে। ম্যাপড, আনম্যাপড ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি— এই তিন বিভাগে প্রায় দুই কোটি নোটিশ জারি হয়েছে বলেও আদালত জানায়। গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও ওয়ার্ড স্তরে প্রতিটি অসঙ্গতির তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপত্তি জানাতে ১০ দিন সময় ও নথি জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে শুনানিস্থলে পর্যাপ্ত জনবল ও কঠোর আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তব সত্য হলো— এত বিপুল সংখ্যক শুনানি এত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা কার্যত অসম্ভব। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। যতদিন না একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, ততদিন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়া উচিত নয়— এই বিষয়টি যেমন আদালতকে বোঝানো জরুরি, তেমনি জনমত গঠন করাও অপরিহার্য।

সঠিকভাবে এসআইআর সম্পন্ন করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর হতে হবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের উপর কড়া নজরদারি, যতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের যুক্ত করা এবং যেকোনো গাফিলতিতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া— এসব এখন সময়ের দাবি। রাজ্য সরকারের অন্তর্ঘাতের প্রতিটি দিক সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনা প্রয়োজন। প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে তার সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। কারণ নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়া নির্বাচন মানেই অনুপ্রবেশকারী ও গ্লোবাল ডিপ স্টেটের ক্রীড়নকদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা তুলে দেওয়া। বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা যাতে নির্বিঘ্নে এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন, সেটাও কমিশনের দায়িত্ব। ভোটার তালিকাই গণতন্ত্রের প্রাণ। তাই পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির উপর কেন্দ্রীয় সরকারেরও তীক্ষ্ণ নজর রাখা জরুরি। কারণ এখানে এসআইআর-বিরোধিতার নামে যা চলছে, তা নিছক রাজনৈতিক লড়াই নয়— এটি ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ডিপ স্টেটের এক অঘোষিত যুদ্ধ, যার অন্যতম রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। □

যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকতেই তৃণমূলনেত্রীর এসআইআর বিরোধিতা

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

রাজ্যে এসআইআর চলছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, একই সঙ্গে এই প্রক্রিয়া চলছে আরও ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। যদিও এসআইআর সম্পন্ন হয়েছে বিহারে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে। ওই ১১টি রাজ্যে এসআইআর নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না থাকলেও, নিত্যদিন সংবাদ মাধ্যমে ঠাঁই করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কারণ এখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করছেন সংবিধান স্বীকৃত এই প্রক্রিয়ার।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম বড়ো সুবিধা হলো দেশ কিংবা রাজ্যের চাবিকাঠি কার হাতে থাকবে, তা ঠিক করেন দেশের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থেই ভোটার তালিকা হওয়া উচিত একেবারে খাঁটি, তাতে ভেজাল দিয়ে গদি আঁকড়ে বসে থাকার কোনো মানেই থাকার কথা নয়। কিন্তু তার পরেও তো দিব্যি গদি আঁকড়ে বসে থাকেন ক্ষমতালোভী একদল নেতা-নেত্রী! বস্তুত, একবার ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেলে তাঁরা আর গদি ছাড়তে রাজি হন না। কারণ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে যে মধুর যোগ তা অমৃতসুধার মতোই। এসব নেতা-নেত্রী দেশ কিংবা জনগণের সেবা করতে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান না, এঁরা আদতে চান নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে। তাই ভারতের রাজনীতির পট খুললে দেখা যায় শুধু পারিবারিক রাজনীতির খেলা। এক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচার করা হয় না, হয় যিনি প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তাঁর বংশের কে আগে ওই পদ দখল করেছিলেন, সেই মানদণ্ডে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত কেন্দ্রে এটাই ছিল দস্তুর। দীর্ঘদিন ক্ষমতার রশি ধরা ছিল কংগ্রেসের নেহরু পরিবারের হাতে। সেই কংগ্রেসের উপজাত দল তৃণমূলও এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ কংগ্রেস পার্টি ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়া দল গড়লেও, তাঁর দলের গায়ে লাগাতে হয়েছে কংগ্রেসের ট্যাগ। আর সেই ট্যাগ লাগিয়েই হয়েছে ক্ষমতা দখল। তার ফলে কংগ্রেসে দেখা দিল ক্ষয় রোগ। আর এঁটুলি কিংবা ছিনে জোঁকের মতো কংগ্রেসের রক্ত খেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস। এই তৃণমূল কংগ্রেস এখন শাসন করছে পশ্চিমবঙ্গ। সামনে নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাই করতে প্রক্রিয়া শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গণতন্ত্রের স্বচ্ছ জলে যাতে ভূতুড়ে ভোটার থেকে না যায়, তাই চালু হয়েছে এসআইআর। আর এখানেই যত সমস্যা তৃণমূলের তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর।

একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, বঙ্গ রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে। সেই মোক্ষম প্রশ্নটি হলো, ক্ষমতায় টিকে থাকতে রাজ্যের শাসক দল কি তবে পেশি প্রদর্শন করবে, নাকি ফিরে যাবে বামেদের সেই থ্রেট কালচারের রাজনীতিতে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের পরপর টানা তিনটে টার্ম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় টিকে থাকার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এই ভূতুড়ে ভোটারেই। বাম জমানায় বাংলাদেশ থেকে ঢুকেছে দলে দলে মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। ২০১১ সালে বামেদের হটিয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। তারপর বামেদের মতোই তারাও খেলতে শুরু করে তুষ্টীকরণের তাস। বস্তুত, এর ফলেই পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওঠে লকগেটহীন বাঁধের মতো। বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে দলে দলে মুসলমান সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। তারপর শাসক দলের দাদা-দিদিদের হাত ধরে তারা জোগাড় করে ফেলে ভারতে বসবাসের অধিকারের জাল কাগজপত্র। তাই তারা জানে অমানিশার আঁধারে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে একবার কোনোভাবে ঢুকে পড়তে পারলেই কেল্লাফতে! এই যে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে জাল কাগজপত্র জোগাড় করে দিয়েছিল

দাদা-দিদিরা, সেজন্য তৃণমূলের কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায় অনুপ্রবেশকারীরা। তার জেরেই বছর বছর ভোটের বহর বাড়তে থাকে রাজ্যের শাসক দলের। তাই বছরের পর বছর জনগণের একটা বড়ো অংশ না চাইলেও, ক্ষমতা ভোগ করে চলেছে তৃণমূল দল।

এই ক্ষমতা আঁকড়ে পড়ে থাকা মানুষগুলি যাতে প্রকৃতই স্বদেশের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হন, সেই কারণেই চালু হয়েছে এসআইআর। আর তাতেই ঘোর আপত্তি মুখ্যমন্ত্রীর। কারণ, তিনি ভালোই জানেন, এসআইআর নামের চালুনিতে আটকে পড়বে মৃত ভোটার, অনুপ্রবেশকারী ভোটার (বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান) এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত ভোটার। যে ভোটাররা হাত উপুড় করে ভোট দিত তৃণমূলে, তারাই যদি ছাঁকনিতে আটকে যায়, তাহলে যে মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসন টলে যাবে! আর সিংহাসন একবার টলে গেলে যে তৃণমূল নামক দলটাই যে কর্পূরের মতো উবে যাবে, তাও বিলক্ষণ জানেন তিনি। শুধু তাই নয়, জেলখানায় দিন কাটাতে হতে পারে অনেক নেতা-নেত্রীকে। যেমনটা জেলের ঘানি টেনে এসেছেন বীরভূমের অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডল, উত্তর ২৪ পরগনার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু এবং খোদ কলকাতার পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সেই কারণেই রাজ্যে এসআইআর করতে দিতে এত অনীহা তৃণমূল নেত্রীর। সংবিধানকে 'প্যান্ডোরার বক্সে' ভরে রেখে তিনি স্বয়ং কলকাতার রাজপথে মিছিল করেন এসআইআরের বিরোধিতা করে।

আর স্বয়ং দলনেত্রী যখন আইন লঙ্ঘন করতে নেমে পড়েন পথে, তখন তাঁর মন্ত্রীরাই-বা বাকি থাকে কেন? অতএব, পথে নেমে পড়ে 'যোগ্য' দিদির, 'যোগ্য' ভাইয়েরা। তারা প্রত্যেকেই পুলিশ-প্রশাসন কবজা করতে মরিয়া। তাই কোনো বিধায়ক গুন্ডা-দুষ্কৃতীদের নিয়ে সটান ঢুকে পড়েন এসডিও অফিসে। সেখানে তাঁর নির্দেশে গুণ্ডাবাহিনী ছিঁড়তে থাকে ফর্ম-৭ (যেমনটা করেছিল বিধায়ক তৃণমূলের অসিত মজুমদারের দলবল)। কেন একজন বিধায়কের নেতৃত্বে দলের মাসলম্যানরা ফর্ম-৭ ছিঁড়লেন? এর উত্তর পেতে গেলে আমাদের জানতে হবে ওই ফর্ম কী জন্য রয়েছে, সেই বিষয়টি।

রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচন কমিশনের এই ঝাড়াই-বাছাই পর্বে মৃত বা স্থানান্তরিতদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ফর্ম-৭ পূরণ করা হয়। সেই ফর্মই ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন বিধায়ক।

এহ বাহ্য। রাজ্যে এসআইআর যাতে বন্ধ করা যায়, সেজন্য চেষ্টার হরেক রকমের কোনো ত্রুটি রাখেননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের ওপর বিভিন্ন সময় নানাভাবে চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়েছিল তৃণমূল। কখনো এসআইআর প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ, কখনো আবার সাধারণ মানুষকে এসআইআর জুজুর ভয় দেখানো, আবার কখনো এসআইআরের শুনানি কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা!

ফরাক্কা, চাকুলিয়ায় বিডিও অফিস ভাঙচুর, ৭ নম্বর ফর্ম জ্বালিয়ে দেওয়া, বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে তৃণমূল আশ্রিত দুধেল গাইদের হিংসাত্মক বিক্ষোভ, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় জেহাদিদের হাতে মহিলা সাংবাদিক নিগ্রহের মতো বিষয়গুলিও সম্প্রতি জায়গা করে নিয়েছে সংবাদমাধ্যমে। বেলডাঙার ঘটনায় জেহাদিদের অপকর্ম ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী দোহাই দিয়েছেন জুম্মাবারের। মানুষের দাবি, এ রাজ্যে আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়েছে সাংবিধানিক ব্যবস্থা, ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে আইনের শাসন। কারণ একজন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সংবিধান-বিরোধী কাজকর্ম করে চলেছেন নিশ্চিন্তে। প্রশ্ন হলো, তিনি কিংবা তাঁর দলের মাতব্বররা কীভাবেই-বা দুষ্কর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছেন?

রাজনৈতিক মহলের একটা বড়ো অংশের মতে, এসআইআরের ছাকনিতে যারা আটকে পড়ছে তাদের পাশাপাশি তৃণমূলের পাশ থেকে সরে গিয়েছেন রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী মুসলমানেরাও। ক্ষমতা হারানোর আতঙ্ক মুখ্যমন্ত্রীকে তাড়া করে ফিরছে সর্বক্ষণ। তাই যেন-তেন প্রকারে ক্ষমতায় টিকে থাকতেই হবে, তা সে জনগণ চাক কিংবা না চাক। সেটা করতে গিয়েই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান করে চলেছেন একের পর এক সংবিধান-বিরোধী কাজ! ওয়াকিবহাল মহলের মতে, চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, গোরুপাচার, রেশন সামগ্রী চুরি-সহ একাধিক অভিযোগে কালিমালিপ্ত হয়েছে তৃণমূলের ভাবমূর্তি। সেই কলঙ্কিত অধ্যায়ের দিক থেকে ভোটার জনার্দনের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে তৃণমূলেশ্বরী হাতিয়ার করেছেন এসআইআরের বিরোধিতাকেই। কারণ তিনি বিলক্ষণ জানেন, বঙ্গভূমে যেভাবে অগ্রগতি ঘটছে বিজেপির, তাতে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি, তা বলাই বাহুল্য।

অতএব, তৃণমূলকে ক্ষমতায় টিকে থাকতেই হবে। কারণ যে যোগ্যতা দিয়ে রাজনীতিতে করে-কম্মে খাওয়া যায়, সেই যোগ্যতা দিয়ে অন্য কোনো চাকরি-বাকরি হয় না, বানের জলে যেমন ভেসে আসে না অর্থ-সম্পদ-যশ। সেজন্য প্রয়োজন যোগ্যতার। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে গেলে তো পড়াশোনা নয়, দরকার স্রেফ জনগণের ভোট। তাই ভোট পেতে নির্বাচনের আগে ও পরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে শাসকদল করে মোচ্ছব, সরকারি কোষাগারের টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয় ক্লাবের ছেলেপুলেদের হাতে রাখার জন্য। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড়ো অংশের মতে, তৃণমূলনেত্রী বুঝতে পেরে গিয়েছেন বিজেপির কাছে এবার তৃণমূলের হার একপ্রকার নিশ্চিত। তাই ক্ষমতার ভরকেন্দ্র থেকে যাতে তিনি ছিটকে না পড়েন, সেই কারণেই এসআইআর নিয়ে এত হইচই করছেন তিনি।

এহেন আবহে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, বঙ্গ রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে। সেই মোক্ষম প্রশ্নটি হলো, ক্ষমতায় টিকে থাকতে রাজ্যের শাসক দল কি তবে পেশি প্রদর্শন করবে, নাকি ফিরে যাবে বামেদের সেই থ্রেট কালচারের রাজনীতিতে? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এবারও ফের রক্তাক্ত হতে পারে রাজ্যের নির্বাচন। কারণ ক্ষমতার চিটে গুড়ে যে পা আটকে গিয়েছে রাজ্যের শাসক দলের! মধুভর্তি চাক ছেড়ে কোনো 'মক্ষীরানি'ই বা সরে যেতে চায় জনাদেশ মাথা পেতে নিয়ে! □

রাজ্যে এসআইআর-এর প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব চলছে

আনন্দ মোহন দাস

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনীকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে চলেছে তা এককথায় ভয়ঙ্কর। রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রতি মুহূর্তে শাসক দলের হস্তক্ষেপ, প্রশাসনের ওপর নানা চাপ সৃষ্টি, ভোটারদের আতঙ্কিত করা এবং এসআইআর শুনানিকেন্দ্রগুলিতে শাসক দলের পরিকল্পিত সন্ত্রাসে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে নির্বাচন কমিশনের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। একটি স্বচ্ছ ও বৈধ ভোটার তালিকার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা নির্বাচন কমিশনের এই কাজে রাজ্য সরকারগুলিও সহযোগিতা করতে বাধ্য। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যসরকারগুলি এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা শাসকদল প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। কিন্তু ইন্ডিজোটে তৃণমূলের সহযোগী দলগুলির দ্বারা পরিচালিত কেরালা ও তামিলনাড়ু সরকার নির্বাচন কমিশনের কাজে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছে। এই মুহূর্তে ১১টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে চললেও পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম। এখানে শাসক তৃণমূল স্থানীয় প্রশাসনকে হাতিয়ার করে প্রতি পদক্ষেপে নির্বাচন কমিশনের কাজে বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু অন্য ১১টি রাজ্যে এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল নিত্যনতুন ন্যারেটিভ তৈরি করে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং রাজ্য সরকারও নির্লজ্জভাবে নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

জেহাদি আক্রমণে আহত সাংবাদিক সোমা মাইতি

গণতন্ত্রে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রথম শর্ত হলো নির্ভুল ভোটার তালিকা। সেজন্য স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকায় নির্বাচন করতে হলে অবৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের বিরোধিতা কেন? তাহলে কি শাসন ক্ষমতা হারাবার ভয়? নাকি অবৈধ ভোটব্যাংকে ধস নামার আতঙ্ক? তাহলে শাসকদল কি মৃত, অযোগ্য ও বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় রাখতে চায়? নইলে রাজ্যে এসআইআর-এর নামে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার এতো তাগিদ কেন?

সাংবিধানিক পদে থাকা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তিনি থাকতে রাজ্যে এসআইআর হতে দেবেন না। এসআইআর স্থগিত রাখার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনে বারবার দরবার করলেও ব্যর্থ হয়েছেন। এই উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তিনি এখন এসআইআর প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। যে রাজ্যে দল ও প্রশাসন সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, সেখানে প্রশাসনের অসহযোগিতায় নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেও সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার কারণে এসআইআর আটকাতে পারেননি। এ যেন সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। না পারছে গিলতে, না পারছে উগরাতে। সেজন্য শাসকদল প্রশাসনকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশলে নির্বাচনের কমিশনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার বিভিন্ন রাস্তা বেধে নিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে উন্নয়ন শিকেয় তুলে দিয়ে শাসকের একমাত্র কাজ হলো এসআইআর-এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

এমনকী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক বৈঠকে বিভিন্নভাবে বিএলও, বিডিও, এসডিও এবং জেলাশাসকদের প্রচ্ছন্নভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং ভোটার তালিকায় কোনো নাম যাতে বাদ না যায় তার জন্য হুমকিও দিয়েছেন। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের কাজে নানা অছিলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারি কর্মী ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা বজায় রেখেছেন, যার ফলে বিএলও-রা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। রাজ্য সরকার এসআইআর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পরোক্ষে নানাবিধ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে চলেছে। কারণ শাসকদল এসআইআর প্রক্রিয়ার পর বিধানসভা নির্বাচন করতে চায় না। তাই নানাবিধ উপায়ে ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণে বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর-কে ঢাল করে তাঁর দলের

কর্মী-সমর্থকদের প্ররোচনা দিয়ে চারিদিকে সন্ত্রাস ও গুন্ডামিতে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন এবং এসআইআর-এর কাজে বাধা দিচ্ছেন বলে নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিট দাখিল করেছে। স্বাধীন ভারতে কোনো মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে এই ধরনের অভিযোগ আছে বলে মনে হয় না। শাসকদল এসআইআর-এর বিরোধিতার নামে ক্রমাগত বিক্ষোভের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের হেনস্থা করছে। তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেছেন। এছাড়া শাসকের মদতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল, সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যম এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে লাগাতার ন্যারেটিভ তৈরি করে জনগণকে আতঙ্কিত করে চলেছে। নিজেদের ব্যর্থতা ও পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি ঢাকতে জনগণের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টাও চলেছে।

যে কোনো মৃত্যু সর্বদা দুঃখজনক কিন্তু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শাসকদল যেভাবে রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শাসকদলের অভিযোগ এখানে নাকি এসআইআর-এর কারণে ১১৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। অথচ অন্য রাজ্যে এসআইআর-এর কারণে মৃত্যুর খবর নেই। এ রাজ্যে কোনো মৃত্যু ঘটলেই এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রবণতা রয়েছে। রাজ্য বিজেপি অভিযোগ করেছে শাসকদলের চাপেই নাকি পরিবারগুলি এসআইআর-এর কারণে মৃত্যু বলতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি করে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে খেপিয়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। অভিযোগ উঠেছে ছোটোখাটো ভুলত্রুটি সংশোধনে বিএলও, ইআরও, এইআরও-দের ক্ষমতা থাকলেও তাঁরা লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির নামে শুনানিতে বহু মানুষকে ডাকছেন। আসলে এই সমস্ত অফিসাররা রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসেবে সমস্ত প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু বদনাম হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের। এছাড়া কিছু প্রচার মাধ্যম ও শাসকদল ভিআইপিদের শুনানিতে ডাকার জন্য হইচই করে ন্যারেটিভ তৈরি করছে। উল্লেখ্য, ভারতীয় সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। কারও জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। আইনের চোখে সকলেই সমান। এটাই গণতন্ত্রের মহিমা। সুতরাং এই ধরনের অভিযোগের কোনো আইনি বৈধতা নেই। নাগরিক হিসেবে দেশের আইন মেনে চলাই নাগরিক কর্তব্য।

এমনকী অভিযোগ উঠেছে, পুরো প্রক্রিয়াকে কালিমালিপ্ত করতে কিছু বিএলও-কে চাপ দিয়ে ইনিউমারেশন ফর্মে বেশ কিছু জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখানো হয়েছে এবং পরবর্তীকালে এদেরকে রাজনৈতিক মঞ্চে হাজির করিয়ে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের উচিত এ বিষয়ে অভিযুক্ত বিএলও-দের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে শাস্তির ব্যবস্থা করা। তা নাহলে এই ধরনের ভ্রষ্টাচার বন্ধ হবে না।

এছাড়া নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে যে আসানসোলের বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রে একজনকে ৩৮৯ জন ভোটারের পিতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। একজনের এতজন সন্তান থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও ১০ থেকে ৩০০ জনের বেশি ভোটার একজনকে পিতা হিসেবে ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন। এটি ইচ্ছাকৃত ভুল, না প্রতারণা তা যাচাই করা আবশ্যক। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই এরা সকলেই সত্য উদ্ঘাটনের জন্য নোটিশ পেয়েছেন।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এসআইআর শুনানি চলাকালীন শুনানিকেন্দ্রে এখন বিএলএ-২ ভোটারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী দল দাবি করেছে যে এর ফলে শুনানিকেন্দ্রে শাসকদল দ্বারা হাঙ্গামা করার আশঙ্কা আরও বেড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের ডিজিপিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

এছাড়াও সর্বোচ্চ আদালত রাজ্যের পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসেও শুনানির ব্যবস্থা করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং নতুন করে আরও বেশি সংখ্যায় নির্বাচন কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ আবার নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং এর ফলে শুনানি প্রক্রিয়া শীঘ্র শুরু করা যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। ফরাক্কা, চাকুলিয়ায় বিডিও অফিস ভাঙচুর, ৭নং ফর্ম জ্বালিয়ে দেওয়া, বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে শাসক দল আশ্রিত 'দুধেল গাই'দের হিংসাত্মক বিক্ষোভ, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় জেহাদিদের হাতে মহিলা সাংবাদিক নিগ্রহের মতো বিষয়গুলি সম্প্রতি রাজ্যের সংবাদ শিরোনামে এসেছে। পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তিনদিন ব্যাপী মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় জেহাদি শক্তি রাস্তা ও রেললাইন অবরোধ, ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে। রাজ্যের পুলিশ অসহায় দর্শকের ভূমিকায় থেকেছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এখন তলানিতে ঠেকেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে রাজনৈতিক মহল আশঙ্কা করছে।

বেলডাঙার ঘটনায় জেহাদিদের অপকর্ম ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী জুম্মাবারের দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রে পুলিশের সক্রিয়তা বেড়ে যায়। এই সুযোগে জেহাদি মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালাচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন স্থানে এই সামাজবিরোধীরা তত্ত্ব সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এইভাবে সারা রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে অরাজকতা চলছে। রাজ্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা ধ্বংসের নগ্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আইন হাতে তুলে নিয়েছেন। শাসকদল ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এখন দুষ্কৃতীদের দখলে। এমতাবস্থায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। তাই ভয়মুক্ত পরিবেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নইলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হবে। ▯

নৈরাজ্যের অবসানের দিন সমাগত, তাই কি এত ভয় ?

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

এসআইআর-কে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে, আর এতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সোৎসাহে সমর্থন ও উসকানি দিয়ে চলেছেন। আগে তেরোবার এসআইআর হয়েছে এবং তাতে অবৈধ ভোটার এবং মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে। কিন্তু এ নিয়ে কোনো বিরোধিতা দেখা যায়নি। এবার শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মাথায়ই যেন বাজ পড়েছে। কিছুদিন আগে পাশের রাজ্য বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেখানে কোনো বড়ো ধরনের গণ্ডগোল ছাড়াই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কোনো বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়! তাঁকে কে বোঝাবে, কাউকে বাদ দেওয়া নয়, বরঞ্চ কোনো বৈধ নাগরিকের নাম যাতে বাদ না যায় সেটা নিশ্চিত করাই নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ। সঙ্গে সঙ্গে এটাও নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করবে যে, যে সমস্ত ভোটার মারা গেছে বা স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁদের নামও যাতে ভোটার তালিকায় না থাকে তা নিশ্চিত করা। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এই সমস্ত কাজ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কাজে কারও হস্তক্ষেপ করার কথা নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ডিএনএ-তে বোধহয় রয়েছে সেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ভাব! আর সবকিছুতেই 'মানব না', 'মানছি না' ভাব! তিনি যেন অন্য কোনো দেশের শাসক! তিনি ভুলে যান, দেশটি ভারত এবং এখানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে। এবং সরকারটির সংবিধান অনুযায়ী এই সংস্থাগুলির কিছু বিধিবদ্ধ কাজও রয়েছে। এতে কোনো রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

আগে কখনো এসআইআর নিয়ে কোনো হাঙ্গামা না হলেও এবার মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কেন আদাজল খেয়ে নেমেছে? কেন তাঁর দুধেল গাইয়েরা সব মিথ্যা অজুহাতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাস্তায় নেমে পড়েছে? বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায়? সম্প্রতি জেলার বেলডাঙ্গায় ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এক পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের কথিত হত্যা

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি সর্বতোভাবে এসআইআর-এর বিরোধিতা কেন করছেন? তিনি কি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর দলের শেষের সে দিন সমাগত?

নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা ১৬ জানুয়ারি থেকে দুই-তিন দিন ধরে বড়ুয়া মোড়ে ১২নং জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করে জেলার জনজীবন পর্যুদস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু ঝাড়খণ্ড রাজ্যের হাসপাতালের এক পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে যে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু কোনো মব লিঞ্চিং-এ হয়নি, নেহাতই আত্মহত্যার ঘটনা। আবার মুর্শিদাবাদ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিস্টেম রিপোর্টেও আলাউদ্দিনের মৃত্যুকে আত্মহত্যা হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কথিত এই 'মব লিঞ্চিং'কে কেন্দ্র করেই মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় দুদিন ধরে তাণ্ডব চালাল জেহাদি মুসলমানদের দল। আর এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ঝাড়খণ্ডের সরকার বিজেপি পরিচালিত নয়, এটা মমতা ও বামপন্থীদের বন্ধুদলের, হেমন্ত সোরেনের সরকার! রাজ্যের উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এই জেহাদি জনতা।

টায়ার পুড়িয়ে, তাণ্ডবের মাধ্যমে ১২নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়েছিল দুদিন; ১২নং সড়ক দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় গাড়ি চলাচল, বন্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণনগর-লালগোলা লাইনের সমস্ত ট্রেন চলাচল। রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন তা দেখেও নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজ্যের যে পুলিশ বিরোধী রাজনৈতিক দল বা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দিতে দ্রুত ঝাপিয়ে পড়ে, শিক্ষকদের আন্দোলনে শিক্ষককে লাথি মেরে আন্দোলন থামিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না, সেই পুলিশই এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু দাঁড়িয়ে ছিল। প্রশ্ন ওঠে, পুলিশ কেন এত দীর্ঘ সময় দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডব চালাতে দিল! অথচ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ তথা কলকাতার যোগাযোগের মূল রাস্তাই হলো এই ১২নং জাতীয় সড়ক। শুধু

রাস্তা অবরোধ করাই নয়, সাংবাদিকদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। রাজ্যজুড়ে জেহাদি দুর্বৃত্তরা পেশিশক্তির আস্ফালন করে চলেছে। সোমা মাইতি নামে এক মহিলা সাংবাদিককে চরম হেনস্থা করা হয়েছে; অভিযোগ, তার শ্লীলতাহানিও করা হয়েছে। তাঁকে তাড়া করে এক মাইলের বেশি রাস্তা দৌড় করানো হয়েছে।

পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকাকেও রেয়াত করা হয়নি; তাঁদের সাংবাদিককেও চরম হেনস্থা করা হয়েছে। আর এসবই হয়েছে রাজ্য পুলিশের চোখের সামনে। পুলিশ এখানে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। তাঁদের চোখের সামনে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থা ও 'মব লিঞ্চিং' করা হলেও, বার বার আবেদন করা হলেও তাঁরা মহিলা সাংবাদিককে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। রাজ্যের মহিলাদের, এমনকী মহিলা সাংবাদিকদেরও কোনো নিরাপত্তা নেই! মুখ্যমন্ত্রীর মদতেই যে এসব করেছে ওই অঞ্চলের জেহাদি দুর্বৃত্তরা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরদিনই তার বাণীতে বলেছেন, শুক্রবারে ওঁরা একটু বিশেষ মুডে থাকে। ওঁরা জমায়েত করে। একটু উৎফুল্ল থাকে। সেই সময় ওঁদের মাঝে না যাওয়াই ভালো ছিল। তিনি এই ঘটনার পেছনে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্ররোচনা আছে বলেও উল্লেখ করেছেন। এ এক কাল্পনিক, মনগড়া অভিযোগ। মানে, মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুক্রবারটা যে কোনো অঞ্চল ওঁরা মুক্তাঞ্চল করে নিতে পারে। সেখানে ওঁদের সন্ত্রাসের রাজত্ব চলবে! সেদিন ওঁরা যা খুশি তাই করবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, ছেচল্লিশের কলকাতার হিন্দু নরসংহার এমনই এক শুক্রবারে শুরু হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথায় কি সেই ইঙ্গিত দিতে চাইছেন? একটা রাজ্যের এক মুখ্যমন্ত্রী কি চাইছেন স্বাধীন ভারতে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের আবার সেই কালো দিন ফিরে আসুক! অবশ্য বাস্তবে তিনি রাজ্যের দিকে দিকে, সমসেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, বেলডাঙ্গা, ক্যানিং, ধুলাগড়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ইত্যাদি স্থানে সেই ব্যবস্থাই করে রাখছেন।

বস্তুত, রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত অশান্তির ঘটনা ঘটে চলেছে। ৭নং ফর্ম জমা দেওয়া নিয়েও বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও বা ফর্ম জমা দিতে দেওয়া হয়নি, কোথাও ফর্ম কেড়ে নেওয়া হয়েছে; কোথাও আবার ৭নং ফর্ম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথাও-বা বিডিও অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। ফরাক্কা, চাকুলিয়া, সমুদ্রগড়, লালবাগ, দুর্গাপুর, আসানসোল, বালুরঘাট, কালিয়াগঞ্জ, বনগাঁ, বসিরহাট ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে তৃণমূলের এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এবং উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা বিডিও অফিসে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। ফরাক্কায় আতঙ্কিত হয়ে ৯ জন মাইক্রো অবজারভার ও পর্যবেক্ষক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। ফরাক্কার বিডিও অফিসে ভাঙচুর এবং হিংসার ঘটনায় সরাসরি যুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা এসডিও অফিসে ৭নং ফর্ম জমা দিতে গেলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁদের কাছ থেকে ফর্ম কেড়ে নিয়ে প্রায় ২৭ হাজার ফর্মে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশের সামনেই জেলা সভাপতির গাড়িতে ইট ছোড়া হয় এবং ভাঙচুর চালানো হয়। একই ঘটনা ঘটেছে বনগাঁয়। সেখানে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া একই অভিযোগ করেছেন। আবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল এসডিও অফিসেও ঘটেছে একই ঘটনা। সেখানে ৭নং ফর্ম জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেখানে এএলএ অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করা হয় এই ঘটনার বিরুদ্ধে। একই ঘটনা ঘটেছে জামুরিয়াতে। একই ঘটনা ঘটেছে জঙ্গিপুর ও রায়গঞ্জে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

অথচ ৭নং ফর্মের মাধ্যমে মৃত, স্থানান্তরিত, ভুয়ো ও একাধিক স্থানে নাম থাকা ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া। তাতে তো কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। ২০০২ সালের পরে, প্রায় ২৩ বছর বাদে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অবশ্য কেউ আপত্তি জানালেই যে কারও নাম বাদ যাবে এমন নয়। কমিশন যথাযথভাবে খতিয়ে দেখেই কোনো সিদ্ধান্ত নেবে। জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২৪ (৬) ধারায় নির্বাচন কমিশনকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটা কমিশনের একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব। তৃণমূল কংগ্রেস দলের সহযোগী ডিএমকে শাসিত তামিলনাড়ু ও সিপিএম শাসিত কেরলায়ও এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, কিন্তু সেখানেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের পক্ষ থেকে নিত্যনতুন সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ, নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে হলে এই ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আর এক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে সকলের, বিশেষ করে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা ও নৈতিক সাংবিধানিক কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি সর্বতোভাবে এসআইআর-এর বিরোধিতা কেন করছেন? তিনি কি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর দলের শেষের সে দিন সমাগত? ক্ষমতা হারানোর আতঙ্ক? দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে নাকি বুঝতে পেরেছেন, এই প্রক্রিয়ায় তার চিরলালিত অবৈধ ভোটব্যাংকে ধস নেমে গেছে, তাকে আর মেরামত করা যাবে না? তাই মানুষকে খেপিয়ে তোলা, বিশেষ করে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের হিংসাত্মক করে দেওয়া? এই করে তিনি কিন্তু বাঁচবেন না! ইতিহাস কিন্তু বড়োই নিষ্ঠুর, কাউকে ক্ষমা করে না। □

অনন্য সম্পাদকীয়

প্রিয়ভাষী স্বস্তিকা পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' পাতাটি অনন্যসাধারণ। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—পূতমন্ত্র দিয়ে শুরু এবং সুভাষিতম্ দিয়ে শেষ, মাঝে মণিমুক্তোর মতো উৎকৃষ্ট বাংলা শব্দ সহযোগে সাধু ভাষায় রচিত নিবন্ধ--- যা বিষয়বস্তু নির্বাচনেও অনন্য। প্রসঙ্গত শব্দ এবং শব্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠা বাক্য হলো একধরনের উদ্দীপক। আমরা যখন পড়ি অথবা শ্রবণ করি, তখন আমরা তার দ্বারা উদ্দীপিত হই। নিউরোনের মধ্য দিয়ে ঢেউ খেলে যায় গোটা শরীরে। ভালো লেখা পড়লে, ভালো ভালো কথা শুনলে, শ্রুতিমধুর মিউজিক শুনলে আমাদের শরীরে আনন্দের উদ্রেক ঘটে। ভালো লাগা এবং আনন্দের উদ্রেক সৃষ্টিকারী হর্মোনগুলি ক্ষরিত হয়। বিশেষ করে সংস্কৃত শ্লোক বা মন্ত্র উচ্চারণের সময় আমাদের শরীরে কিছু নিউরো-ফিজিওলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটে। নিউরাল নেটওয়ার্কের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

মন্ত্র উচ্চারণের সময় তার ছন্দ, স্পন্দন ও উচ্চারণের কম্পন মস্তিষ্কের বিশেষ অঞ্চল যথা ব্রোকা ও ওয়ের্নিকের অঞ্চল, থ্যালামাস ও লিম্বিক সিস্টেম সক্রিয় করে তোলে। ফলে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে যে মন্ত্র জপের সময় শরীরে সেরোটোনিন, ডোপামিন, এন্ডোরফিন ও অক্সিটোসিন এর মতো হরমোনগুলির নিঃসরণ বাড়ে। এগুলি মানসিক প্রশান্তি আনে, আনন্দের উদ্রেক সৃষ্টি করে এবং স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া মন্ত্রের ছন্দবদ্ধ উচ্চারণ প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে সক্রিয় করে তোলে। ফলে হৃদস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয়ে শরীর ও মন এক সুরে আসে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মূর্ছনায় জীবের বিকাশ ঘটে দ্রুত। উদ্ভিদের ফুল-ফল ভালো হয়। তাই ভালো লেখা পড়লে, ভালো ভালো কথা শুনলে, শ্রুতিমধুর মিউজিক শুনলে আমাদের ভালো লাগে, আনন্দ লাগে। সুরে সুরে অনুরণিত হয় গোটা শরীর ও মন। ফলস্বরূপ ভালো লেখা, ভালো কথা বা শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের রেশ থেকে যায় অনেকক্ষণ। স্বস্তিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সম্পর্কে যা সর্বাংশে সত্য। সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ কেবল ধর্মীয় আচারের বিষয় নয়। এটি মন ও শরীর উভয়ের বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ। তাই বাল্মীকি রামায়ণের যে শ্লোক দিয়ে সম্পাদকীয় পাতাটি শুরু হয়, তা শুরুতেই একরাশ প্রশান্তি ও তৎসহ আনন্দ এনে দেয়। একই কারণে স্বস্তিকা পত্রিকার নবাঙ্কুর বিভাগে 'এসো সংস্কৃত শিখি'—প্রচেষ্টাটি একটি বিশেষ ইতিবাচক দিক।

—অজয় ভট্টাচার্য,
পল্লীবার্তা রোড, বনগ্রাম, উ: ২৪ পরগনা।

সন্ত্রাসবাদী কারা?

১০৯৫ সাল থেকে শুরু হয়ে শতবর্ষের ওপর চলা ক্রুসেডে বিশ্ব দেখেছে রিলিজিয়নের বিস্তারবাদ তথা আধিপত্যবাদ। সেটা কি টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি নয়? আমরা দেখেছি, মধ্যযুগে বিশেষ করে ১৬০০ সালে ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত কর্পোরেট চার্টারের মাধ্যমে সুকৌশলে আধিপত্যবাদ তথা বিস্তারবাদ। সেসব কি টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটির পর্যায়ে পড়ে না? তারপর ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই কর্পোরেট কলোনিয়ালিজমের মাধ্যমে সুকৌশলে আধিপত্যবাদ তথা বিস্তারবাদের নগ্নরূপের সাক্ষী থেকেছে বিশ্ব। এসব কি টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি নয়? আর ২০২৬ সালে তেল ও গ্যাসের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার লক্ষ্যে, আমরা দেখেছি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে নির্লজ্জভাবে বন্দি করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যেতে। এই প্রয়াস কি কেবলমাত্র এবং একমাত্র টেরসিস্ট অ্যাক্টিভিটি বলেই গণ্য হবে? আসলে মানবসভ্যতা যতই এগিয়ে যাক না কেন, তথাকথিত 'বাদ'-এর হাত থেকে বোধহয় পরিত্রাণ নেই। সেটা হতে পারে রিলিজিয়ন বিস্তারবাদ কিংবা আধিপত্যবাদ; ঔপনিবেশিকতাবাদ কিংবা মজহবি কট্টরবাদ; হতে পারে মার্কসবাদ কিংবা পুঁজিবাদ; ধনতন্ত্রবাদ কিংবা সমাজতন্ত্রবাদ। অথবা গণতন্ত্রবাদের মুখোশে হয়তো তেলতন্ত্রবাদ।

এককথায় ছলে-বলে-কৌশলে তেলকে কুক্ষিগত করার আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টাই কি শুধুমাত্র টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটির আওতাভুক্ত? ১৯৭৯ সালের রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে কট্টর মজহবি নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেইনির আগমন কিংবা ২০২৬-এর ঘটে চলা রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে, সর্বাত্মক এক ধ্বংসের মাধ্যমে, উদারচেতা, আধুনিকমনস্ক প্রিন্স রেজা পহেলবির সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন কি টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটির পর্যায়ে পড়ে না? আসলে ঘটে চলা সমস্ত কিছুর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র— এসবের ওপর নির্ভর করে। সময়ের চাহিদাটা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এজন্যই তো শেক্সপিয়র বহু আগেই তাঁর 'হ্যামলেট' নাটকে বলে গেছেন, 'দেয়ার ইজ নাথিং আইদার গুড অর ব্যাড, বাট থিংকিং মেকস্ ইট সো'। সবচাইতে অবাক করা ব্যাপার হলো, বিশ্বনিয়ন্ত্রক মহামহিম 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ' এখন পর্যন্ত টেররিস্টের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে ব্যর্থ। কাজেই টেররিস্ট বলতে নানা মুনির নানা মত। আমার কাছে সেই হলো টেররিস্ট যে বা যারা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়-অন্যায় বুঝেও, অন্যায়ের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ না করে, ক্ষুদ্র স্বার্থে কিংবা ভয়ে, চোখ বুজে তা মেনে নেয়--- এক কথায় সোকলড্ ইন্টেলেকচুয়ালস্ অব অল সোসাইটিস ইরেসপেক্টিভ অব কাস্ট, ক্রিড অ্যান্ড রিলিজিয়ন।

—নারায়ণ শঙ্কর দাশ,
উত্তর দিনাজপুর।

নাগরিকের নিরাপত্তা

২০৪৭-এর লক্ষ্যে নয়া বিমা আইন— সুরক্ষিত ভারতের পথে ঐতিহাসিক সরকারি ঘোষণা 'সবকা বিমা, সবকা সুরক্ষা'— এই জাতীয় অঙ্গীকারকে কেবল স্লোগানে আটকে

না রেখে বাস্তব প্রশাসনিক দায়িত্বে রূপ দিতে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। সদ্য সংসদে পাশ হওয়া নয়া বিমা আইন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করল বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহল। লক্ষ্য একটাই— স্বাধীনতার শতবর্ষে, অর্থাৎ ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে বিমার সুরক্ষার আওতায় আনা।

এই নয়া আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে— উন্নয়নের কেন্দ্রে থাকবে মানুষের জীবন, জীবিকা ও নিরাপত্তা। দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি কিংবা দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তার মুহূর্তে কোনো ভারতীয় নাগরিক যেন আর্থিক ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত না হন। সেই লক্ষ্যেই এই আইনকে কার্যকর করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করাই এই নীতির মূল দর্শন। দেশীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিমা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা উন্মুক্ত করেছে কেন্দ্র। তবে এখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া অবস্থান— ভারতে কার্যরত কোনো বিমা সংস্থার চেয়ারম্যান, সিইও ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে ভারতীয় নাগরিক থাকা বাধ্যতামূলক। ফলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক পুঁজি, প্রযুক্তি ও দক্ষতার সুবিধা মিলবে, তেমনই অন্যদিকে দেশের নীতিনির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভারতীয়দের হাতেই। বিদেশি অংশগ্রহণ থাকলেও জাতীয় স্বার্থে কোনো আপোশ নয়— এই বার্তাই তুলে ধরেছে সরকার।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আইন কার্যকর হলে বিমা পরিষেবা শহরের সীমানা পেরিয়ে গ্রাম, প্রান্তিক অঞ্চল ও অবহেলিত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছবে। কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা— সকলেই পাবেন আর্থিক সুরক্ষার ছাতা। বিশেষ করে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাকে দ্রুত, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ দালালচক্র বা জটিলতার ফাঁদে না পড়েন।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এই নয়া বিমা আইন শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সংস্কার নয়, বরং সামাজিক ন্যায় ও আর্থিক নিরাপত্তার এক নতুন রূপরেখা। যেখানে উন্নয়নের সুফল কেবল পরিসংখ্যানের পাতায় নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে দৃশ্যমান হবে। 'সবকা সুরক্ষা'কে কাগজের প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবের রক্ষাকবচে রূপান্তর করাই এই আইনের মূল লক্ষ্য।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০৪৭-এর লক্ষ্য সামনে রেখে এই আইন ভবিষ্যতের ভারতের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠতে চলেছে। নিরাপদ নাগরিক, সুরক্ষিত পরিবার এবং আত্মবিশ্বাসী সমাজ— এই তিনের উপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠবে আত্মনির্ভর ভারত। সেই পথেই এক দৃঢ়, সাহসী ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

এসআইআর-এর পোস্টমর্টেম

ইচ্ছেমতো নাম বদল করা লোকজন এসআইআর-এ বিপদে পড়েছে। ছোটোবেলায় আমারও যে ওইরকম নাম বদলের ইচ্ছা হতো না তাই বলছি না। তবে তা সম্ভব হয়নি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার কারণে। সেই তারাই আজ আটকে গেছে এসআইআরের গেরোয়। ভোটার কার্ডে এক নাম, আধার কার্ডে পছন্দ মতো অন্য নাম। তারাই আটকেছেন এসআইআরে। কেউ কেউ নিজের মাঝের নাম ও প্রথম নামের অদলবদল করেছেন ভোটার ও আধার কার্ডে। যেমন শেখ হাফিজুর রহমান আছে ভোটার কার্ডে। আধার কার্ডে আছে হাফিজুর শেখ রহমান। ধরা তো নিশ্চয়ই পড়বে এসআইআরের গেরোয়। এরপর আগেই ভোটার তালিকায় কারও কারও প্রথম নাম ও মাঝের নাম এক সঙ্গে হয়েই ছিল। তাদেরও এবার শুনানিতে ডাকা হয়েছে। বাবা-মা ও সন্তানের বয়সের ব্যবধান অস্বাভাবিক কম বা বেশি। তাদেরও শুনানিতে ডাকা হয়েছে। বলুন তো তাদের না ডাকলে কীভাবে ঠিক হবে তাদের ঠিক বয়স বা সঠিক নাম?

হয়তো তাঁদের কেউ কেউ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। কেউ-বা দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগে ছিলেন। কেউ-বা এমএলএ, কেউ কেউ মন্ত্রী ছিলেন বা আছেন। তাদের ভুল বয়স বা নাম কিংবা ঠিকানা কি নির্বাচন কমিশন হাত গুণে ঠিক করে দেবে?

তৃণমূল ও তাদের চটি চাটা বুদ্ধিজীবী, পত্রপত্রিকাগুলো মানুষকে নিশ্চয়ই মূর্খ ভাবে। তাই তারা বলছেন বা পত্রিকায় ছাপছেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভারতরত্ন শংসাপত্রও গ্রহণ করছে না নির্বাচন কমিশন। যে যে শংসাপত্র নেওয়া হবে তা তো সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করে দিয়েছে। সেখানে তো ভারতরত্নের শংসাপত্রের কথা নেই। তা তো নির্বাচন কমিশনের কোনো কর্তা নিজে থেকে গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক এই ভাবেই প্রতিদিন নিয়ম করে এরা নির্বাচন কমিশনের বিরোধিতা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। একে তো অপরাধ বললে কম বলা হয়। গঠনমূলক সমালোচনা করলে এরা কখনো মানুষকে বিভ্রান্ত করে উসকানি দিত না। এরা একবারও নিখুঁত বা সঠিক ভোটার তালিকা হোক চাননি। তাঁরা চাননি অন্য দেশের অবৈধ নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক। বাদ দেওয়া হোক মৃত ভোটারের নাম। তাই নিত্য নতুন ফন্দি ফিকির। গণতন্ত্র প্রিয় ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এবার এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, দেশের ও গণতন্ত্রের জন্য এই সমস্ত মানুষ, রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান বিপজ্জনক।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

With Best Compliments From -

A

Well Wisher

হিন্দু বিবাহে স্ত্রী-আচার

অরুণা রায়চৌধুরী

বাঙ্গালি সমাজে পূর্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয়— এই দুই পরিচয় কেবল ভৌগোলিক বিভাজন নয়, বরং আচার, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতির এক গভীর সাংস্কৃতিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত উৎসব-অনুষ্ঠানে স্ত্রী-আচার ও বিবাহসংক্রান্ত রীতিনীতিতে এই পার্থক্যগুলি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। পূর্ববঙ্গীয় বলতে মূলত বর্তমান বাংলাদেশ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের বোঝায় এবং পশ্চিমবঙ্গীয় বলতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের বোঝানো হয়। এই দুই সমাজের নারীদের জীবনাচরণ ও বিবাহ প্রথা বহু শতাব্দীর লোকাচার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও পারিবারিক রীতির দ্বারা পরিচালিত।

পূর্ববঙ্গীয় সমাজে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে সাংসারিক ও পারিবারিক আচার পালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। ব্রত, উপবাস, পারিবারিক ঠাকুর-দেবতার ওপর আস্থা— এসব পূর্ববঙ্গীয় নারীর জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। নববধূর প্রবেশে 'বরণ' ও 'দধিকর্মা', নবান্ন, লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা ইত্যাদিতে নারীরাই মূল উদ্যোক্তা।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে স্ত্রী-আচার অনেক বেশি শাস্ত্রনির্ভর ও নিয়মবদ্ধ। শুদ্ধাচার, ব্রতকথা, উপনয়ন ও শ্রাদ্ধসংক্রান্ত বিধিনিষেধ— এসব বিষয় পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। নারীজীবনে নিয়মিত পূজাপাঠ ও ব্রত পালনের প্রবণতা উভয় বঙ্গেই বেশি দেখা যায়।

পূর্ববঙ্গীয় বিয়েতে কনের পোশাকে সাধারণত লাল বেনারসি বা মসলিনের প্রভাবযুক্ত শাড়ি দেখা যায়। সিঁদুরদান, সপ্তপদী, মালাবদল— এসব হিন্দু শাস্ত্রসম্মত আচার হলেও লোকাচারের প্রভাব বেশি। বিয়ের সময় গান, বিশেষ করে বিবাহসঙ্গীত ও কৌতুকপূর্ণ ছড়া পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গীয় বিয়েতে পাটিপত্র, আইবুড়োভাত ও গায়ে হলুদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইবুড়োভাতে কনের জীবনের শেষ অবিবাহিত ভোজনের প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে সীমিত হলেও আচারগুলি অত্যন্ত বিস্তারিত ও নিয়মমতো হয়।

এছাড়া পূর্ববঙ্গীয় সমাজে বৌভাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। নববধূর রান্নার দক্ষতা ও সংসার সামলানোর ক্ষমতার প্রতীকীভাব এখানে প্রকাশ পায়। শ্বশুরবাড়িতে নববধূর মানিয়ে নেওয়া এবং পারিবারিক বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গীয় বিয়েতে কনের পোশাকে সাধারণত লাল পাড় সাদা শাড়ি, শাঁখা-পলা, মুকুট ও গয়না বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গীয় বিবাহে লগ্ন গণনা, কোষ্ঠী মিলন ও শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। বিয়ের প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট নিয়মে সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে বাসরঘর, বৌভাত ও কালরাত্রির মতো আচার রয়েছে। নববধূর আচরণ, শুচিতা ও নিয়ম মানার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্বশুরবাড়িতে নববধূর দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সামাজিক প্রত্যাশা তুলনামূলকভাবে কঠোর।

পূর্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় স্ত্রী-আচার ও বিবাহ রীতিতে প্রধান পার্থক্য দেখা যায় নিয়মের কঠোরতা ও লোকাচারের প্রাধান্যে। পূর্ববঙ্গীয় সমাজে আবেগ, আতিথেয়তা ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব বেশি, আর পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে শাস্ত্র, নিয়ম ও আচারগত শুদ্ধতার প্রতি ঝোঁক বেশি। তবে উভয় সমাজেই নারীর ভূমিকা পরিবারকেন্দ্রিক এবং বিবাহকে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়।

বর্তমান যুগে নগরায়ণ, শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রভাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গীয় উভয়েরই আচারগত পার্থক্য অনেকটাই ম্লান হয়েছে। আন্তঃবিবাহ বেড়েছে, বহু প্রাচীন রীতি সহজতর হয়েছে। তবুও উৎসব, বিয়ে ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই ঐতিহ্যগুলি এখনো রীতিনীতির অংশ হিসেবে টিকে আছে। স্ত্রী-আচার ও বিবাহ রীতির মধ্য দিয়ে বঙ্গের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির বহমানতা আজও জীবন্ত। □

মহিলাদের শরীরে ধূমপানের কু-প্রভাব

ডাঃ বলরাম পাল

প্রথমেই একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। এই লেখকের তখন ছোটোবেলা। সেটা সত্তরের দশক হবে। বাবা-মার সঙ্গে গিয়েছিলাম উত্তরপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলে। সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এক ধর্মশালায়। আমাদের পাশের ঘরে আরও এক বাঙ্গালি দম্পতি ছিলেন যাদেরকে আমি জেঠু ও জেঠিমা বলে ডাকতাম। এদিকে ধর্মশালায় যেমন হয় মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক যৌথ কলঘর। একদিন সন্ধ্যায় সেই জেঠিমার কলঘরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তিনি সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করেন কলঘরের এক কুঠুরি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। তাঁর নিশ্চিত ধারণা হয় ওই কুঠুরিতে কোনো পুরুষ প্রবেশ করেছে এবং সে ধূমপান করছে। মহিলাদের কুঠুরিতে পুরুষ প্রবেশ করেছে এতে তাঁর বিড়ম্বনা বাড়ে। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। প্রকৃতির ডাকে কে কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবেন! অগত্যা পুনরায় সেখানে গিয়ে দেখেন এক দেহাতি মহিলা হাতে লোটা নিয়ে সেই কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসছেন। এতক্ষণে তাঁর ভুল ভাঙলো। তিনি কল্পনাই করতে পারছেন না যে মহিলারা আবার ধূমপান করে, কারণ সে যুগে বঙ্গনারীদের চোখে সে এক বিরল দৃশ্য। তবে ইদানীংকালে শহুরে আধুনিক সংস্কৃতিতে মহিলাদের মধ্যে ভীষণভাবে ঢুকে পড়েছে ধূমপানের প্রবণতা।

মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা এত মারাত্মক বেড়েছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। উন্নয়নশীল দেশগুলি তো বটেই এমনকী ইসলামিক দেশ বাংলাদেশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ইদানীংকালে অনেক মেয়ে মনে করে হাতে সিগারেট থাকলে বেশি আধুনিকা মনে হয়। একজন স্বাধীন নারী হওয়ার প্রেরণায় সে মনে করে প্রকাশ্যে ধূমপান তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রকাশের সূচক। কেউ কেউ আবার এই ভুল

ধারণা বিশ্বাস করেন যে ধূমপান তাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে যা বিপরীতে তাদের ত্বক ও শারীরিক গঠনের ক্ষতি করে।

মহিলাদের ধূমপানের ফলে কী কী প্রভাব পড়তে পারে :

১. **মাসিক সম্পর্কিত প্রভাব :** গবেষণায় দেখা গেছে, যে মহিলারা ধূমপান করেন তাদের অনিয়মিত বা বেদনাদায়ক পিরিয়ড দেখা যায়। যে মহিলারা ধূমপান করেন তাদের অল্প বয়সে মেনোপজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. **গর্ভধারণে প্রভাব :** ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে ধোঁয়া শরীরে প্রবেশ করে তার মধ্যে এমন কিছু রাসায়নিক আছে যা মহিলাদের গর্ভধারণের ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক। এতে গর্ভধারণে যেমন সমস্যা হয় তেমনই গর্ভপাতের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। শুধু তাই নয় এর প্রভাবে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

৩. **ভ্রূণের ওপর প্রভাব :** মায়েদের ধূমপানের কারণে ভ্রূণের ফুসফুস ঠিকমতো বিকশিত হয় না, এমনকী মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনাও বেশি।

৪. **হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া :** ধূমপান করেন এবং মেনোপজের মধ্য দিয়ে গেছেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যারা ধূমপান করেন না তাদের তুলনায় এই মহিলাদের হাড়ের ঘনত্ব কম। বাকি মহিলাদের তুলনায় তাদের হিপ ফ্র্যাকচার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৫. **রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস :** এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা অস্থিসন্ধিগুলিতে বেদনাদায়ক প্রদাহ সৃষ্টি করে। যারা ধূমপান করেন না তাদের তুলনায় যারা ধূমপান করেন তাদের রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৬. ধূমপানকারী মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি বিষণ্ণতায় ভোগেন।

৭. **আলসার জনিত সমস্যা :** এই সমস্যা অবশ্য নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন ধূমপানের ফলে মাড়ির রোগের সমস্যা যা শেষ পর্যন্ত হাড় ও দাঁতের সমস্যায় পরিণত হয়। মাড়ির রোগের মতো, ধূমপানের কারণে পেটে আলসার হতে পারে যার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

৮. **ছানির সমস্যা :** যাঁরা ধূমপান করেন তাদের চোখে ছানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৯. **শ্বাসকষ্টের সমস্যা :** ধূমপানের ফলে ফুসফুসের রোগ হয় এবং ধূমপানকারী মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি শ্বাসকষ্টে ভোগেন।

১০. **ক্যানসারের ঝুঁকি :** এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে ফুসফুসের ক্যানসার ধূমপানকারীদের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ঘটে। সিগারেটের ধোঁয়ায় থাকা অনেক রাসায়নিক ক্যানসারের জন্য দায়ী বলে জানা গেছে। অতিরিক্ত ধূমপান শুধু জরায়ুমুখের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় না, মেনোপজের আগে ধূমপায়ী নারীদের পায়ুপথের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, দুনিয়াজুড়ে যখন সিগারেট খাওয়ার গড় প্রবণতা কমছে, তখনই অস্বাভাবিক হারে মহিলাদের সিগারেট খাওয়ার হার বেড়েছে। মহিলাদের সিগারেট খাওয়ার প্রতিযোগিতায় মার্কিন মুলুকের পরই রয়েছে ভারতের স্থান।

একটা বিষয় পরিষ্কার, বর্তমানে রাস্তা ঘাটে, বিভিন্ন কলেজের সম্মুখে, রেস্তোরাঁ, শপিংমল প্রভৃতি জায়গায় অল্প বয়সি মেয়েদের মধ্যে যে হারে ধূমপান করতে দেখা যায় তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এই কু-অভ্যাস থেকে সমাজকে বাঁচাতে এখনই সর্বস্তরে সচেতনতার উদ্যোগ সমাজকেই নিতে হবে। ▯

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উত্তর দমদম নগরে হিন্দু সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে. সনাতনী হিন্দুধর্ম সমিতির উদ্যোগে গত ১৮ জানুয়ারি ব্যারাকপুর জেলার উত্তর দমদম নগরের বিরাটির গৌরীপুর কালীবাড়ি বসতির মহাজাতি ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো হিন্দু সম্মেলন। মা-বোনেদের শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সাধুসন্তদের দ্বারা তুলসীমঞ্চের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভসূচনার পর বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত এবং কৃষ্ণনাম সংকীর্তন হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, ক্ষণা মাতাজী, স্বামী অনঘানন্দ পুরী মহারাজ-সহ বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সাধু-সন্ন্যাসীগণ। ৬ জন সাধুসন্ত প্রবচন দানের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ লিটন অধিকারী সঙ্ঘ শতবর্ষ, পঞ্চ পরিবর্তন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের করণীয় বিষয়ে ভাষণ রাখেন। এরপর উপস্থিত সকলেই গীতার তিনটি অধ্যায় পাঠ করেন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

INTO YOUR LIFE, WE BRING LIGHT, WARMTH, & STRENGTH.

INTO YOUR LIFE, WE BRING SURYA ROSHNI.

Surya Roshni is the trusted companion bringing light, warmth, and care to every moment.
From purity in every sip to safe spaces, we bring innovation and reliability into your life.
Let's brighten up your world together!

Consumer Lighting | Steel & PVC Pipes | Fans | Appliances | Professional Lighting

I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY

SURYA ROSHNI LIMITED | www.surya.co.in | surya | surya_roshni | surya.roshni | surya-roshni

Email: info@surya.in Tel.: +91-11-47108000

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে পদযাত্রা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের হাতে পরাজয় বরণ করে পাকিস্তান এবং ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা-সহ আত্মসমর্পণ করেন জেনারেল নিয়াজি। সেই দিনটি স্মরণে গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া-র উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় 'বিজয় দিবস'। ২০২৪ সালে জেহাদি অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হয় ড. মহম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ক্ষমতায় এসে '১৬ ডিসেম্বর' বিজয় দিবস উদ্‌যাপন বন্ধ করে পাকিস্তানপন্থী জেহাদিদের দ্বারা পরিচালিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী এই সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের এই মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী অবস্থান এবং বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া-র উদ্যোগে কলকাতার বুকে একটি পদযাত্রা আয়োজিত হয়। এদিন মেয়ো রোড-স্থিত গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়। পদযাত্রাটির গন্তব্যস্থল ছিল চৌরঙ্গী-স্থিত নেহরু মূর্তি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'বিজয় দিবস' উদ্‌যাপন বন্ধ হওয়ার প্রতিবাদে আয়োজিত এই পদযাত্রা এবং মুক্তিযুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্তদের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মানুষ। সংগঠনের পক্ষ থেকে পদযাত্রা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা ও নির্যাতনের বিষয়ে ভারতীয় নাগরিকদের কাছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলবার আহ্বান জানানো হয়।

'স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা'র উদ্যোগে শীতবস্ত্র দান অনুষ্ঠান

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে কীর্তনীয়া ঋতা দাসীর সেবাশ্রমে আয়োজিত হয় দুঃস্থদের শীতবস্ত্র দান অনুষ্ঠান। এদিন মা-বোনেদের হাতে শাল ও কম্বল তুলে দেন বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থার সেক্রেটারি মিঠু চক্রবর্তী। এই সংস্থার সেবামূলক কাজের বিষয়টি উদ্যোক্তারা তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন।

मध्यप्रदेश हुआ

किसी भी समाज के विकास में अनुशासन, प्रोत्साहन और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण पक्ष है। यही नहीं समाज की विसंगति, सुधार और कल्याण के लिए भी आधारभूत पथ निर्मित करते हैं। मध्यप्रदेश में इसी आधार पर समाज निर्माण का अभूतपूर्व इतिहास रचा गया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की वर्चुअली उपस्थिति में बालाघाट में दो अंतिम नक्सली दीपक उइके और रोहित ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ मध्यप्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि विगत ४२ दिनो में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन में ऐतिहासिक रूप से 7 करोड़ 75 लाख के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आज जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वर्ष २०२६ तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प हैं।

मध्यप्रदेश में नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासोंने प्रदेश को लाल सलाम मुक्त कर दिया है। इस संपूर्ण घटनाक्रम का यदि हम आकलन करें तो प्रेदश में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को दृढ़ता और मानवीय दृष्टि के साथ लागू किया गया। इससे जहां नक्सल संगठनो की आंतरिक संरचना कमजोर हुई वहीं उनके भीतर विश्वास का नया भाव उत्पन्न हुआ। नक्सलियों को आत्मसमर्पण और कठोर कारवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी के साथ ही आत्मसमर्पण करने वालों को संविधान एवं मुख्यधारा में शमिल होने का अवसर प्रदान करना इन दोनों रणनीतियों से निर्णायक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दस हार्डकोर, सशस्त्र एवं वर्दीधारी नक्सलियों ने एके-47, इंसास राइफल, एसएलआर, वाकी-टाँकी जैसे आधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह नक्सलवाद के अंत की दिशा में एक निर्णायक पहल थी। इसके लिए सुरक्षा बलों के प्रयास और रहयोगी जनता दोनों ही साधुवाद के पात्र है।

पुलिश महानिर्देशक श्री कैलाश मकवाणा ने इस आत्मसमर्पण को सुरक्षा बलों की रणनीतिक सचिंग, सठीक खुफिया जानकारी, निरंतर अभियान और स्थानीय समुदाय का बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया। हाँक फोर्स, जिला पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों ने मंडला-बालाघाट सीमांत क्षेत्र तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों को सशस्त्र नक्सली गतिविधियों से मुक्त किया।

लाल सलाम मुक्त

पिछले एक वर्ष में हुए घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि नस्कल ठांचा निरंतर कमजोर हुआ। 1 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन की हार्डकोर महिला नक्सली सुनीता ओयाम ने आत्मसमर्पण किया था। मलाजखंड-दरँकसा दलम मे एसीएम रही सुनीता पर तीन राज्यों मे कुल 14 लाख रूपये का इनाम था। मध्यप्रदेश की आत्मसमर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति-2023 के अंतर्गत यह पहला बड़ा आत्मसमर्पण था, जिसने पूरे क्षेत्र में नक्सली ढांचे के कमजोर होने के संकेत दिये। इसके बाद अनंत उर्फ विकास नगपुरे सहित कई अन्य सशस्त्र नक्सलियों के समर्पण ने नक्सली आधार को कमजोर किया।

वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों ने बालाघाट जोन में दस हाईकोर नक्सलियों का सफाया किया, जिनपर 1 करोड़ 86 लाख रूपये का इनाम घोषित था। वहीं बढ़ते पुलिस दबाव के चलते एमएमसीजोन के 17 नक्सलियों ने महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया। अब बालाघाट से आखिरी दो नस्कलियों के आात्मसमर्पण के बाद प्रेदश से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है।

इस उपलब्धि को प्राप्त करने में जहां सरकार की नीतियों का कारगर अमल प्रभावी है वहीं पुलिस बलों की सक्रियता का विशेष योगदान है। इस समूचे घटनाक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस बलों ने बलिदान दिया है। वस्तुतः, किसी भी सुरक्षा अभियान की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है, जब विकास और शासन की पहुँच समानांतर रूप से मजबुत हो। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय पहल की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 46 एकल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश ने यह साबित कर दिया कि कठोर सुरक्षा अभियान और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण नीतियाँ जब साथ चलती हैं, तब परिवर्तन निश्चित ही संभव है। अब प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। प्रदेश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां विकास को भय से मुक्त वातावरण, शासन को जनता का भरोसा और युवायों को अवसर मिल रहा है। यह मध्यप्रदेश के लिए युगांतकारी ऐतिहासिक समय है। सरकार, सुरक्षा बलों और जनता के सम्मिलित प्रयासों से नक्सलवाद का अंत हो गया है।

ADVT.

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদ্‌যাপন এবং ‘বন্দে মাতরম্’ গানের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

গত ১১ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের প্রত্যন্ত গ্রাম ঘোষের চকে শিবালয় মন্দিরে সমাজব্রতে দীক্ষিত তরুণ সন্ন্যাসী রাজমোহন বৈরাগীর উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মদিবস। এদিন একই সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এদিন স্বামীজীর ১৬৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের সঙ্গে— বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বক্সীর ১৩৮তম জন্মদিবস, মাস্টারদা সূর্য সেন ও বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের ৯৩তম আত্মবলিদান দিবস, বিপ্লবী প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্যের ৯৪তম আত্মবলিদান দিবস, বিপ্লবী সুনীতি চৌধুরীর ৩৯তম প্রয়াণ দিবস, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের ২৭তম প্রয়াণ দিবস এবং সমগ্র জাতির সঞ্জীবনী মন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্য-সহ অসংখ্য মানুষ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, সুব্রত চাকীর স্ত্রী তন্দ্রা চাকী, কন্যা সোনিকা চাকী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্প্রপৌত্র ইন্দ্রনীল মিত্র, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রপৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন, বিপ্লবী ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্যের দৌহিত্রী তনুজা ঘোষাল ও নাতজামাই ফাল্গুনী ঘোষাল, কবি মোহিনী চৌধুরীর পুত্র দিগ্বিজয় চৌধুরী, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তর ভাইপো পরিমল সেনগুপ্ত, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রপৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার, বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পরিবারের সদস্য প্রবীর গিরি ও রীতা গিরি, বিপ্লবী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মৃণালকান্তি রায়, বিপ্লবী তারকনাথ মিত্রের পুত্র অতনু মিত্র ও পুত্রবধূ পাপিয়া মিত্র, বিপ্লবী তারাপ্রসাদ চক্রবর্তীর পুত্র শক্তিপ্রসাদ চক্রবর্তী ও নাতবৌ অর্পিতা চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক ও লেখক ড. তপন চট্টোপাধ্যায়, ঘোষের চক শিবালয় মন্দিরের সভাপতি ড. স্বপন বৈরাগী, সম্পাদক মানবেন্দ্র ঘরামী, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণদেব ভট্টাচার্য, রুণু বণিক ও জয়ন্ত মণ্ডল। যে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা, সভামঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে সেই অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিতর্পণ করেন। তাঁদের বক্তব্যের পর শিবালয় মন্দিরের মাইক্রোফোনে যখন ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত উচ্চারিত হয়, তখন প্রায় ৩০০ শিশু শিক্ষার্থীর হাতে উড়তে থাকে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। এদিন হিন্ডকন কেমিক্যালসের পক্ষ থেকে কাশীনাথ দে ও প্রভাত ঝা প্রায় তিন শতাধিক শিশুর হাতে তুলে দেন খাতা-কলম-সহ শিক্ষায় ব্যবহারযোগ্য নানা উপহার সামগ্রী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লবী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যা দীপশিখা চৌধুরী। কলকাতা শহর থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে থেকে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তরুণ সন্ন্যাসী রাজমোহন বৈরাগী ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে এই কর্মকাণ্ডে ব্রতী হয়েছেন। এদিনের স্বামীজীর জন্মদিবস উদ্‌যাপন এবং বরেণ্য বিপ্লবীদের স্মরণ অনুষ্ঠানটি এক কথায় ছিল অভিনব ও অভূতপূর্ব।

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

বেলেঘাটা ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

বিগত বছরের মতো এবারও গত ১১ জানুয়ারি 'বেলেঘাটা ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী'র উদ্যোগে বেলেঘাটা রোটারি ক্লাবে আয়োজিত হয় রক্তদান ও নিঃশুল্ক স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। ভারতমাতা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ বিভাস মজুমদার, পূর্বভাগ সহ-সঙ্ঘচালক ও বেলেঘাটা ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর সভাপতি বিশ্বনাথ নন্দী, পূর্বভাগ প্রচারক ডাঃ পলাশ দলুই, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর কার্যকরী সভাপতি অজয় গোয়েল, পূর্বভাগ পরিবার প্রবোধন প্রমুখ ও বেলেঘাটা ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত এবং বেলেঘাটা সাংগঠনিক নগরের সম্পর্ক প্রমুখ দীপক দেবনাথ। প্রদীপ প্রজ্বলনের পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশ্বনাথ নন্দী। শিবিরে ৫০ জন রক্তদান করেন। নিঃশুল্ক স্বাস্থ্যশিবিরে হোমিওপ্যাথি, চক্ষু পরীক্ষা ও ইসিজি-র ব্যবস্থা ছিল। বহু ব্যক্তি এই নিঃশুল্ক স্বাস্থ্যশিবিরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যপরীক্ষার সুবিধা পান। সমাজের অনেক বিশিষ্টজনের সহযোগিতায় এদিনের শিবির সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

বনগাঁয় হিন্দু সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার নাথ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সংগঠন সম্পাদক তাপস বারিক প্রমুখ।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক

ভিষগাচার্য জীবক

বিনয় কুমার মণ্ডল

তক্ষশীলা নগরীর উত্তর প্রান্তে অরণ্য মধ্যে বিশাল পরিধির হ্রদ। লক্ষাধিক পদ্ম হ্রদের শোভাবর্ধন করেছে। হ্রদের তীরে সযত্ন ললিত অর্জুন, অশোক, অপরাজিতা, সর্পগন্ধা প্রভৃতি নানা ঔষধি বৃক্ষ। বনের উপকণ্ঠে আশ্চর্য সুন্দর এক আশ্রম। আশ্রমের চারপাশে ছোটো ছোটো অনেক কুটির।

ছাত্রেরা প্রত্যুষে আহ্নিক শেষে আশ্রমের পাঠস্থলে গোময় লেপিত অঙ্গনে উপবিষ্ট। প্রত্যেকের সামনে কাষ্ঠবেদী, তার উপর সজ্জিত ভূর্জপত্র ও মসীলেখনী। তাদের সম্মুখে নিম্ববৃক্ষ তলে উচ্চবেদিতে উপবিষ্ট আশ্রমগুরু ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ আত্রেয়। কয়েক মুহূর্ত ধ্যানস্থ থেকে ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন— বৎসগণ, আজ আমরা আলোচনা করব চরক সংহিতার বনৌষধির গুণাগুণ অধ্যায়, উত্তম হয় যদি পত্রে লিখে নাও। ভবিষ্যতে হয়তো কথাগুলি ভুলে যেতে পার, চিকিৎসাকালীন যে কোনো সময় এইসব কথার প্রয়োজন হতে পারে।

—বৎসগণ! অর্জুনবৃক্ষের বল্কলনির্যাস হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করে। এর শতবিন্দু নির্যাস শতবিন্দু মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে তিন প্রহর অন্তর সেবন করালে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা হ্রাস পায়— গুরুদেব তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে ছাত্রদের বিতরণ করতে শুরু করলেন—

সর্পগন্ধী পত্ররস রক্তচাপ বৃদ্ধির অমোঘ ঔষধ। এই পত্ররস অনিদ্রাজনিত রোগে উপকার দেয়, উন্মাদরোগে আশ্চর্যজনক ফল দেয়।

গুরুদেব জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশ অবারিত করছেন, ছাত্ররা গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি নিজ নিজ পত্রে লিখে নিচ্ছে। সমস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে এক পবিত্র নীরবতা বিরাজমান।

ঋষি আত্রেয় সম্মুখে উপবিষ্ট ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন— বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে থাকলেন প্রিয় ছাত্র জীবককে। অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন তার মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতি প্রভাসিত— তিলকস্থানে তৃতীয় নয়নের জ্যোতি।

এই জীবক আশ্রমিক হবার প্রার্থনায় গুরুদেব তাকে প্রশ্ন করেছিলেন— তুমি ধনীর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে এ পথ বেছে নিতে চাও কেন? প্রত্যুত্তরে জীবক মৃদু হাস্যে আত্রেয়কে বিপরীত প্রশ্ন করল— গুরুদেব, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কেন রাজার বিলাসিতা, সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন?

আত্রেয় জ্ঞানের মহাসাগর। জীবককে সংক্ষেপে বললেন— তিনি মানুষকে অমরত্ব দান করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

—আমিও মানুষকে অমরত্ব দান করব, জীবকের উত্তর, আপনি আমাকে উপযুক্ত করে তুলুন।

আত্রেয় ক্ষণমাত্র নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন— বৎস কী অভিলাষে আমার আশ্রমে এসেছ?

—আপনার পদতলে বসে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করব।

—প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করেছে?

—আমায় পরীক্ষা করুন।

মৃদু গম্ভীর স্বরে আত্রেয় বললেন— তুমি নিশ্চয়ই জানো— চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বে বংশপরিচয় দান করা একান্ত আবশ্যক, প্রাথমিক পাঠে নিশ্চয়ই জেনেছ। চিকিৎসাশাস্ত্রে মিথ্যা ভাষণের কোনো স্থান নেই, কঠোর সত্যের উপর ভিত্তি করেই চিকিৎসাশাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে।

জীবককে নির্বাক দেখে আত্রেয় অনুমান করলেন তার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে— বললেন, তুমি কি সত্য কথা বলতে দ্বিধা করছ?

—না, জীবকের দৃপ্ত উত্তর, ভয় পাই না বলেই সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে গিরিব্রজ নগরী থেকে আপনার পদতলে উপবিষ্ট হয়েছি।

—গিরিব্রজ নগরী? কী তোমার পরিচয়?

—জানি না। কেউ বলে আমি ধনীশ্রেষ্ঠ উপানন্দের সন্তান, কেউ বলে— অদম্য ক্রন্দনের ঢেউ কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দিল।

আত্রেয় ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গান্তরে এলেন। ভেবে দেখ তুমি কি চিকিৎসাশাস্ত্রের কঠোর নিয়মাবলী পালন করতে পারবে? তুমি ক্লান্ত, শিষ্য কুটিরে বিশ্রাম কর। দিবা ভোজনের পর তোমার সঙ্গে আরও নানা বিষয়ে কথা বলব।

অন্নব্যঞ্জন পাক সমাপ্ত হলে গুরু আত্রেয় ছাত্রদের নিয়ে ভোজনালয়ে প্রবেশ করলেন। ধৃতবালকে নির্দেশ করলেন জীবককে নিয়ে আসার জন্য। ধৃতবাল ফিরে এসে গুরুদেবকে জানাল— জীবক ধ্যানে নিমগ্ন। এই শুনে অনিরুদ্ধ ব্যঙ্গের সুরে বিরূপ মন্তব্য করল।

ঋষি আত্রেয় রুষ্ট কণ্ঠে বললেন— তোমার কাছ থেকে এমন হীন মন্তব্য আশা করিনি, যে চরিত্রের ভালো-মন্দ কিছুই তোমার জ্ঞাত নয়, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা অত্যন্ত গর্হিত। তাছাড়া চিকিৎসকের চরিত্রে কখনো হিংসা, দ্বেষ, লোভ, কাম প্রতিফলিত হওয়া উচিত নয়।

আত্রেয় জীবকের কুটিরে প্রবেশ করে দেখলেন— জীবক পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন। আত্রেয়ের প্রবেশের কিছুক্ষণ পরে জীবন চোখ খুলে দেখল ঋষি আত্রেয় সম্মুখে দণ্ডায়মান। আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে জানাল— ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আমার ধ্যান সার্থক হলে, আপনি সশরীরে আবির্ভূত হন। বিস্মিত হলেও সে ভাব প্রকাশ না করে আত্রেয় বললেন— সকলে অপেক্ষা করছে। দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রস্তুত, চল।

পরবর্তীকালে শুরু হলো পঠনপাঠন। গুরুদেব উজাড় করে দেন তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার। ছাত্ররা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করে তা রেখে দেয় স্মৃতির মণিকোঠায়।

চিকিৎসা গুরু ঋষি বিষ্ণু আত্রেয় সমবেত শিষ্যদের জ্ঞান বিতরণ করছেন— বৎসগণ! নীরোগ জীবনই হলো প্রকৃত স্বাস্থ্য। রোগ মানুষের জীবনে অভিশাপ। চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠকালে অবশ্যই মনে রাখবে, রোগ মানুষের দেহে কখনো অকস্মাৎ দেখা দেয় না। বিভিন্ন উপসর্গের মাধ্যমে দেহ প্রথমে সতর্ক করে দেয়। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতার জন্য সেই সাবধানতা সম্পর্কে সচেতন হয় না, ফলে রোগের জন্ম ঘটে।

—মস্তিষ্ক মনুষ্যদেহের সর্বোচ্চ গ্রন্থি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, বিভিন্ন অনুভূতি, বিভিন্ন সঞ্চালন স্নায়ু শিরার মাধ্যমে দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে। শিষ্যরা তন্ময় হয়ে শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করে চলেছে।

শিষ্যদের তন্ময়তা লক্ষ্য করে গুরুদেব উদাত্ত কণ্ঠে বলে চলেছেন— ভেষজ ঔষধ সম্পর্কে আলোচনার আগে বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বৃক্ষের পত্র, শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড, মূল থেকে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ তৈরি করা হয়। কোনো বৃক্ষের কাণ্ডে ঔষধিগুণ বর্তমান, আবার কোনো বৃক্ষের পত্রে বা মূলে ঔষধিগুণ দেখা যায়। ঔষধ নির্বাচন ও সেবনের মাত্রা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে চিকিৎসায় ভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

জীবক উঠে দাঁড়িয়ে বলল— আচার্যদেব, আমি শল্য চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের অভিলাষী।

সৌম্য হাসিতে আত্রেয়র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন— বৎস! চিকিৎসাশাস্ত্রে কখনো উতলা হতে নেই। শল্যচিকিৎসার পাঠ গ্রহণের আগে ঔষধশাস্ত্র শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। বিনা ঔষধিজ্ঞানে চিকিৎসার সব শাস্ত্রই মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

আত্রেয় পুর্নবার তার পাঠদান আরম্ভ করলেন।

হঠাৎই ছাত্র পুরাবর্ত চিৎকার করে উঠল— গুরুদেব, ক্ষুধায় স্মৃতিভ্রম ঘটছে, প্রাণ যায় যায় অবস্থা। পাঠদান স্থগিত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আত্রেয়। মধ্যাহ্ন সূর্য অপরাহ্নের প্রান্তে ধাবমান। ধীরভাবে বললেন— প্রাণী মাত্রেই ক্ষুধার্ত হয়। আহার দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। কিন্তু মানুষ উন্নত শ্রেণীর জীব, সে অমৃতস্য পুত্রাঃ, জঠরের ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে যে মস্তিষ্কের ক্ষুধা আহরণ করে— সেই মানব জীবনের অধিকারী। চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো মহান শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণে মস্তিষ্কের ক্ষুধাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

গুরু-শিষ্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে পাঠন ও পঠনের মাধ্যমে। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুকাল। আত্রেয় ছাত্রদের বললেন— বৎসগণ! আমরা আমাদের অভীষ্ট জ্ঞান অর্জনের প্রায় শেষ প্রান্তে— যদিও জ্ঞানলাভের সীমা অপরিসীম। তবুও বাকি অংশটুকু ব্যবহারিক বা প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এস, একদিন আমরা ঔষধি বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছি তা প্রত্যক্ষ করি।

বনমধ্যে ভ্রমণ করতে করতে আত্রেয় প্রতিটি গাছ-লতা-গুল্ম সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় করাচ্ছেন, তার সঙ্গে তার গুণাগুণ, ব্যবহার, অনুপান সম্পর্কে জ্ঞান দান করে চলেছেন। বলে চলেছেন, শিষ্যের কর্তব্য কোনো পাঠ্যবস্তু স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত সকাতরে প্রশ্ন করা, প্রশ্ন না করলে গুরু কখনোই বুঝতে পারেন না শিষ্যের প্রয়োজন কতখানি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে না ওঠা পর্যন্ত শিষ্যের শিক্ষালাভ এবং গুরুর শিক্ষাদান সমাপ্ত হয় না।

মধ্যাহ্নবেলায় আত্রেয় শিষ্যদের বললেন, আজ এই পর্যন্ত থাক। তোমরা সঙ্গে আনা শুষ্ক আহার উদরস্থ করে বনমধ্যে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় ভেষজ বৃক্ষের পত্র, গুল্ম, লতার অংশ সংগ্রহ কর। মনে রাখবে, আমরা বনমধ্য স্থলে আছি। সূর্যাস্তের আগে আমাদের কুটিরে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। ছাত্ররা বনমধ্যে গভীরে প্রবেশ করলে আত্রেয় ধ্যানে মগ্ন হলেন।

বেশ কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মৃদু কোলাহলের শব্দে আত্রেয়র ধ্যান ভঙ্গ হলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সূর্য অস্তগামী। ছাত্ররা একে একে প্রত্যাবর্তন করছে। তাদের সকলের সংগ্রহে বৃক্ষপত্র, লতা, গুল্মের অংশ। কেউ কেউ অনেক পরিমাণ হওয়ায় স্কন্ধে বহন করে আনছে। শুধুমাত্র জীবক শূন্য হস্তে মাথা অবনত করে দণ্ডায়মান। আত্রেয় সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন তোমাদের প্রত্যেককে আমার প্রশ্ন করার আগে জীবককে আমি প্রশ্ন করতে চাই— তুমি কি ঔষধিগুণ সম্পন্ন কোনো উদ্ভিদ বৃক্ষাদি বনমধ্যে লক্ষ্য করনি, না আমার পাঠদানের কোনো অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে?

নতমস্তকে দণ্ডায়মান জীবক আর্তস্বরে বলে উঠল, ক্ষমা করবেন গুরুদেব! বনমধ্যে প্রবেশ করে দেখি ও তো তলমূলী, নিম্ব, নিকুশা, ব্রজক, ভল্লতক, ভূর্জ, মকুস্ত, মধ্যান্তিক, মধুক, ভালক, ভিকস্তক, শালী, পর্ণ, শিঙ্গ, শিরীষ, হরিদ্রা, হিঙ্গ, হিঙ্গুপনী, পদতলে দুর্বা— যা বিষহর ঔষধি এবং রস প্রয়োগে রক্তপাত বন্ধ হয়। চরক সংহিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে; তাছাড়া নিদান শাস্ত্রমের অনুসরণে রচিত রত্নমালা আমরা কণ্ঠস্থ, সুশ্রুত সংহিতা আমার নিকট বেদের সমান। আপনার জ্ঞানদান এতই প্রবল ও স্বচ্ছ যে সেসব কথা স্মরণ করেই আমি এমন কোনো বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, মূল প্রত্যক্ষ করিনি যার কোনো ঔষধি গুণ নেই। তাই কাউকে পৃথক করে সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমার অক্ষমতাকে মার্জনা করবেন।

আত্রেয় সস্নেহে জীবককে আলিঙ্গনপূর্বক বলেন— ধন্য জীবক, তুমি ধন্য! সার্থক আমার শিক্ষাদান, তোমার নিরীক্ষণ যথার্থ। পৃথিবীতে

এমন কোনো বৃক্ষরাজি, ফুল, ফল নেই, যে তার ঔষধি গুণ নেই। শুধুমাত্র শিক্ষা ও মস্তিষ্ক বিচারে তা প্রয়োগ করতে হয়। আমি সকলের সঙ্গে তোমাকে আশীর্বাদ করছি জীবনে জয়ী হও। চল, সকলে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করি, কাল আমরা মনুষ্য শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ/সম্যক জ্ঞানলাভ করব।

পরদিন শিষ্য সমভিবাহারে আত্রেয় বনভূমি মধ্যস্থলে উপনীত হলেন। সেখানে প্রস্তর প্রাচীরের মধ্যভাগে কয়েকটি ঘর। আত্রেয়র আদেশে একজন দ্বার খুলে দিল। আত্রেয় ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যস্থলে চাদরে ঢাকা একটি শব। চাদর অপসারিত করতে দেখা গেল একটি পুরুষের মৃতদেহ। মৃতদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদিত। জীবক দেখতে থাকল চর্মের অভ্যন্তরে স্নেহস্তর, স্নেহস্তরের গভীরে মাংসপেশী, মাংসপেশীর অন্তরালে অস্থিগ্রন্থি।

আত্রেয় একটি সরু যষ্ঠি তুলে নিয়ে বললেন, বৎসগণ! শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তোমাদের এই স্থানে এনেছি। যষ্ঠি দ্বারা সর্বপ্রথম বর্ণ, নাসিকা, মুখ, চক্ষুর বিষয়ে জ্ঞানদান করলেন, তারপর চর্মের বিস্তৃত বিবরণ দিলেন, তারপর মেদ, পরবর্তী অধ্যায় মাংসপেশী, তারপর অস্থি সম্পর্কে বর্ণনা করলেন।

বৎসগণ, আজ এই পর্যন্ত থাক। পরবর্তী দিনে আমরা অন্ত্র, গ্রন্থি ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। মৃতদেহ সর্বরোগের আধার, বেশিক্ষণ এই ঘরে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, কোনো রোগ শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সেই জন্য স্নানের মধ্য দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। আমরা ফিরবার সময় স্রোতস্বিনীর জলে স্নান করে আশ্রমে ফিরব।

এইভাবে কেটে গেল সাতটি বছর। আত্রেয় বললেন, বৎসগণ, তোমাদের পাঠ সম্পূর্ণ। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োগ প্রথা শিক্ষা না করলে, এই পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তক্ষশীলা নগরপ্রান্তে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। তক্ষশীলা নগর ব্যতিরেকেও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ চিকিৎসার প্রত্যাশায় ওই কেন্দ্রে আসে। ওই কেন্দ্রে তোমরা সকলেই স্বহস্তে চিকিৎসা করার সুযোগ পাবে। এই প্রসঙ্গে মহামতি সুশ্রুতের একটি উদ্ধৃতি তোমাদের শোনাচ্ছি, মনে রাখলে উত্তর-জীবনে সার্থক চিকিৎসক রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহামতি সুশ্রুত বলেছেন, পক্ষী যেমন দুই পক্ষের উপর ভর করে আকাশে উড্ডীন হয়, চিকিৎসকও তেমনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সার্থক হয়। পক্ষী যেমন একটি পক্ষের উপর ভর করে উড়তে পারে না, ঠিক তেমন চিকিৎসকও শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় সার্থক চিকিৎসক হতে পারে না। সার্থক চিকিৎসক হবার নিমিত্ত পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন।

পক্ষকাল চিকিৎসালয়ের আবাসিক সন্ন্যাসী চিকিৎসকদের সঙ্গে কাটাবার পর আত্রেয় শিষ্যদের নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। আবাসিক চিকিৎসকরাও অন্যান্য চিকিৎসকদের সঙ্গে জীবকের শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভেষজের প্রশংসা করলেন।

আত্রেয় শিষ্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন— 'চিকিৎসাশাস্ত্রকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে সাজিয়ে দেবার জন্য আর্যাবর্তের চিকিৎসাশাস্ত্র চিরকাল তার কাছে ঋণী থাকবে।

আত্রেয়র পরবর্তী প্রশ্ন— মাতৃজঠরে ভ্রূণের কোন অঙ্গ সর্বপ্রথম পুষ্টিলাভ করে? ধন্বন্তরির মন্তব্য কী?

আবারও জীবকের উত্তর— ভ্রূণদেহের সর্বাঙ্গ একই সঙ্গে পুষ্টিলাভ করে। সেইজন্যে অন্তঃসত্তার প্রথমদিন থেকে প্রসবকালের মধ্যে ভ্রূণের সর্বাঙ্গ পুষ্ট হয়ে একটি সুন্দর শিশুর জন্ম হয়।

উত্তরদানের পর কান্নায় ভেঙে পড়ল জীবক; মনে ভেসে উঠল তার জন্মের কথা।

নিজ আসন ছেড়ে উঠে এসে আত্রেয় বুকে জড়িয়ে ধরলেন জীবককে। মস্তকে হাত রেখে বললেন— আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি বৎস, তোমার কীর্তিতে তুমি অমর হবে, তোমার জন্মকালীন কথা মানুষ ভুলে গিয়ে তোমাকে পূজা করবে।

জীবক আত্রেয়কে প্রণাম করে বলল— গুরুদেব! আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করতে পারি। তাদের জীবনে এনে দিতে পারি নতুন আলোর সন্ধান।

আত্রেয় বললেন— তথাস্তু।

শিক্ষা সমাপ্ত।

জীবকের এবার ঘরে ফেরার পালা। কোথায় যাবে, কীভাবে শুরু করবে ভিষগাচার্যের নতুন জীবন, অনন্ত এক জিজ্ঞাসা। সম্বল ভূর্জপত্রে স্বহস্তলিখিত গ্রন্থরাজি এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ আত্রেয়র স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকৃতি। বিদায় পূর্বে গুরুসমীপে উপস্থিত হলো জীবক। আত্রেয় তার মাথায় হাত রেখে বললেন— আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তোমার শিক্ষা যথার্থই সম্পূর্ণ হয়েছে। তুমি আমার চেয়েও জ্ঞানী। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তুমি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। সাত বছর তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ; এখন থেকে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন চিকিৎসক।

তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই বৎস জীবক, অবন্তীরাজ আমার কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মগধরাজ বিম্বিসার অর্শজনিত রোগে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তিনি আমাকে একজন কৃতী চিকিৎসকের সন্ধানে পত্র দিয়েছেন। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি এই মুহূর্তে তুমি গিরিব্রজ নগরীতে গিয়ে মহারাজ বিম্বিসারকে নিরাময় কর। মহারাজ তথাগত বুদ্ধের অত্যন্ত স্নেহভাজন।

আবার সেই গিরিব্রজ নগরী। যে নগরী থেকে রাতের অন্ধকারে তাকে চলে আসতে হয়েছিল। জীবক দোদুল্যমান, কিন্তু গুরুদেবের নির্দেশ শিরোধার্য। রোগযন্ত্রণায় কাতর মানুষের সেবা তার মন্ত্র। সেই ডাক উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব। তার সঙ্গে তথাগত বুদ্ধের আশীর্বাদ ভিক্ষার কামনা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ভিষগাচার্য জীবক। কাঁধের ঝুলিতে গুরুদেবের স্বাক্ষর যুক্ত স্বীকৃতি, নিজস্ব গ্রন্থরাজি ও কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র। লক্ষ্য শুধু এগিয়ে চলা। যেখানে আছে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ। আর কোনোদিন হয়তো তার জন্মদাত্রী মা একান্ত গোপনে তার কাছে এসে পরিচয় দিয়ে বলবেন— আমি তোর মা! তুই আমার বুকে আয়। আর আছেন ভগবান বুদ্ধ। আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাঁরই বাণী— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলল ভিষগাচার্য জীবক। □

কম্বোডিয়ার প্রিয়াবিহার শিবমন্দির

কৌশিক রায়

কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ড নামক দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে খেমের স্থাপত্য রীতিতে তৈরি একটি শিব মন্দিরের ওপর আধিপত্য নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মন্দিরের এই বিতর্কে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহিম।

যে মন্দিরটিকে নিয়ে গত পাঁচ দশক ধরে এতো বিতর্ক সেটির নাম প্রিয়াবিহার বা পবিত্র স্থল। দুটি দেশেই বৌদ্ধমতের প্রাধান্য। প্রায় এক হাজারের বেশি সময় ধরে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে কাম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের বা শ্যাম ও কম্বোজ দেশদুটির। ভারত থেকে আগত কাম্বোডীয় রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ কাম্বোডিয়াতে আঙ্কোর অঞ্চলে আঙ্কোর ভাট বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। থাইল্যান্ডের আয়ুমিয়া আসলে শ্রীরামচন্দ্র ও রাজা দশরথের অযোধ্যা বলে মনে করা হয়।

প্রিয়াবিহার শিব মন্দিরটি নির্মাণ করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজা প্রথম সূর্যবর্মণ (১০০৬-১০৫০ খ্রিস্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ (১১১৩-১১৫০ খ্রিস্টাব্দ)। শিব মন্দিরটি দর্শন করতে বহু ভারতীয়-সহ বিদেশি পুণ্যার্থী ও পর্যটকরাও প্রতি বছর দলে দলে আসতেন। এই মন্দিরটি নির্মাণের পিছনে মহান সাধক কম্বু (যার নাম থেকে কম্বোডিয়া নাম হয়েছে) এবং নাগবংশীয় রাজতনয়া সোমাকে পরিণয়কারী রাজপুত্র প্রথম কৌণ্ডিন্যেরও অবদান আছে। 'কম্বোজ' কথাটির অর্থ কম্বু-র বংশধরেরা। ফরাসিরা এখনো কম্বোডিয়াকে 'কম্বোজ' বলে অভিহিত করে থাকেন। কম্বোডিয়ার কাবাল স্পিয়ান নামক এলাকাতে একহাজারটি শিবলিঙ্গ মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকটি মন্দিরে শিবের মূর্তি খোদাই করা আছে। প্রিয়াবিহার মন্দিরটি দাংগ্রেক পর্বতচূড়ার ওপরে অবস্থিত। ঠিক ২২৫০টি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে মন্দিরটিতে পৌঁছানো যায়। সিঁড়িগুলি সুন্দর কাঠের তৈরি। সিঁড়ি তৈরিতে ইউনেস্কোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মন্দিরটিতে সমান্তরালভাবে একটি পাথরের সিঁড়িও আছে। একটি ঘনজঙ্গল অতিক্রম করে মন্দিরটিতে প্রবেশ করা যায়।

প্রিয়াবিহার দেউলটির উত্তুঙ্গ চূড়াগুলি যেন আকাশ ছুঁতে চায়। এই মন্দিরটি তৈরি করতে বেশ সময় লেগেছিল। প্রায় ৪০০ বছর ধরে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল দ্বারকার সোমনাথ এবং ওড়িশার লিঙ্গরাজ মন্দিরের সমতুল্য এই কম্বোডীয় শৈব মন্দিরটি। মন্দিরটির স্থাপত্য রীতির অনুপম জটিলতা, মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দির, মামল্লপুরমের মন্দির এবং বৃহদেশ্বরের মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরটিতে হাতির মাথার ওপর নৃত্যরত শিবের একটি সুন্দর কারুকার্যময় মূর্তি আছে অনেকটা নটরাজ মূর্তির মতো। মূর্তিটি প্রিয়া বিহারের গর্ভগৃহে রক্ষিত। মন্দিরটিতে পাঁচটি বৃহদাকার, অনিন্দ্যসুন্দর প্রবেশদ্বার বা গোপুরম আছে। প্রিয়া বিহার মন্দিরটির ওপর অনেকবার হামলা চালিয়েছে থাই সেনাদল। তাদের নিশ্চিন্ত কামানের গোলা বা শেল পড়ে আছে মন্দিরটির চারদিকে। তবে, মন্দিরটির কাঠামোর কোনো ক্ষতি হয়নি। ১৯৫০ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায় কম্বোডিয়া। তারপর থেকেই এই মন্দিরটি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। মন্দিরটির দখল নিয়ে হল্যান্ডের দ্য হেগ-এ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদর দপ্তরে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তবে, বর্তমানে প্রিয়া বিহার মন্দিরটির ওপর কম্বোডিয়ার আধিপত্যই বেশি। মন্দিরটিকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারেও বড়ো ভূমিকা নিয়েছে কম্বোডিয়া। কম্বোডিয়ার উদ্যোগে মন্দিরটি ইউনেস্কো তালিকাতে বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যের বস্তু হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। সেজন্যই ঈর্ষান্বিত হয়েছে থাইল্যান্ড। ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে তাই দুই দেশের সংঘর্ষ শুরু হয়। কাম্বোডিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হুন সেন অনেকটাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রিয়াবিহার মন্দিরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। তদানীন্তন কম্বোডীয় উপপ্রধানমন্ত্রী সোক আন-এরও এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান আছে। প্রিয়া বিহার মন্দিরটির পুনঃসংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে মহাচীন, আমেরিকা, জার্মানি, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। ▫

কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা

মরিচঝাঁপির গণহত্যা

মরিচঝাঁপিতে যখন পশ্চিমবঙ্গের সিপিআইএম সরকার বনভূমি রক্ষার কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগ করে প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তু মানুষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করল। সেই সময় সেই দ্বীপে উদ্বাস্তুদের আড়াই থেকে তিন হাজার শিশু ছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৭৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' ঘোষণা করেছিল। অথচ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ওই তিন হাজার শিশুর মুখের খাদ্য কেড়ে নিতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি। অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু হয়েছে শত শত শিশুর।

গোপাল চক্রবর্তী

ছবিতে যেমন দেখা যায় সারিবদ্ধ ছোটো ছোটো ঘর। ঘর না বলে কুঁড়েঘর বলাই ভালো। হোগলাপাতা, বাঁশ, গাছের ডাল, কঞ্চি, পলিথিন শিট, দড়ি, পেরেক ইত্যাদি যৎসামান্য উপকরণে তৈরি অথচ আশ্চর্য সুন্দর। ছোটো উঠোন, একটুখানি দাওয়া, একপাশে তুলসী মঞ্চ। বাপ-ঠাকুরদার ভিটে, দেশের মাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। দেশভাগের জন্য, সেসব তো আর অল্পদিনে বানানো সম্ভব নয়। সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত জনবিরল দ্বীপে তাঁরা জীবন বাজি রেখে গড়ে তুলেছেন নতুন বাসভূমি। মায়াময়, ছায়াঘেরা, স্বপ্নের গ্রাম।

এরা পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দু, দেশবিভাগের নির্মম শিকার। এইসব ছিন্নমূল মানুষ, যারা মূলত খুলনা, বরিশাল কিংবা ফরিদপুর জেলার অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এদের পুনর্বাসন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এইসব উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের। পরিবার পিছু পাঁচবিঘে জমি, নগদ টাকা, আন্দামানে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা। তাঁদের বক্তব্য উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পাঠানো যাবে না। সেখানে হয়তো তারা বাঘের পেটে যাবে, নয়তো হাঙ্গর কুমিরের পেটে কিংবা জনজাতিদের বিষাক্ত তিরে মরবে।

কমিউনিস্টদের বাধা উপেক্ষা করে যেসব উদ্বাস্তু আন্দামান যাওয়ার জাহাজে উঠেছিল, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা যাত্রী সেজে সেই জাহাজে ওঠে। জাহাজ মাঝসমুদ্রে গেলে ওরা ধ্বনি তোলে, আমরা আন্দামান যাবো না, জাহাজ বন্দরে ফিরিয়ে নাও। নয়তো আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবো। নিরুপায় ক্যাপ্টেন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জাহাজ বন্দরে ফিরিয়ে আনেন। যেদিন এই কমিউনিস্টদের উপেক্ষা করে যারা আন্দামানে পাড়ি দিতে পেরেছিল, তাদের আজ সেখানে সোনার সংসার।

আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ড. প্রফুল্ল ঘোষ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের ব্যাপারে নীরব ছিলেন। বামপন্থীদের একটা অংশ উদ্বাস্তুদের সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিন উদ্বাস্তুদের দায়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপানোর চেষ্টা করলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে কোনো আগ্রহই দেখা যায়নি।

অবশেষে ১৯৫৮ সালের দিকে বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তবর্তী বৃষ্টিহীন, অনুর্বর দণ্ডকারণ্যকে বেছে নেওয়া হয়। দণ্ডকারণ্যের 'মানা' কেন্দ্র উদ্বাস্তুদের প্রধান শিবির হয়ে উঠল।

অনাহার, অর্ধাহার, জলাভাব, রোগব্যাধি এবং সরকারের অবহেলার মধ্য দিয়ে হতভাগ্য বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা কুড়িটি বছর অতিক্রান্ত করল। ১৯৭৭ সাল পশ্চিমবঙ্গে তখন কংগ্রেসকে হারিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই সময়ে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু শিবিরে হাজির হলেন বামফ্রন্ট সরকারে রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিভিন্ন উদ্বাস্তু সমাবেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল বামপন্থীরা আগেও বলেছিল, আর এখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে এবার পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হবে। এই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল আরও এককাঠি এগিয়ে স্লোগান তুললেন

'সুন্দরবন চলো।'

তাদের কথায় বিশ্বাস ও ভরসা করে উদ্বাস্তুরা দলে দলে এতদিনের বাসস্থান ছেড়ে অগ্রসর হলো পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ট্রেনে এসে তারা প্রথম ভিড় জমিয়েছিল হাসনাবাদ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ও আশেপাশে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই উদ্বাস্তুদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এই অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোর দিকে প্রথম সাহায্যের হাত বাড়ালো ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। পেটের জ্বালা না হয় মিটলো কিন্তু প্রাকৃতিক ডাক ইত্যাদি কারণে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংঘাত শুরু হলো। রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং উদ্বাস্তুদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তু নেতাদের কোনো কথা শুনতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানিয়ে একটি পত্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়। যারা এই পত্র বিলি করতে গিয়েছিল, উদ্বাস্তুরা এই অভিসন্ধি অবগত হয়ে তাঁদের অপমানিত ও বিতাড়িত করে। ইতিমধ্যে অনেকেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সুন্দরবনে আবাদ অঞ্চলে গেছে। তারা সরকারের কাছে জমি দাবি করছে। তখন প্যালেস্তাইনের উদ্বাস্তুদের জন্য বাসভূমি আদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা সোচ্চার; রাস্তাঘাট, অফিস, আদালতে তোলপাড়, তবে বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে তাদের এই মৌনতা কেন? পশ্চিমবঙ্গের সরকারে যারা অধিষ্ঠিত তারাই একদিন পূর্বপাকিস্তানের বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি তুলেছিল এখন তারা ক্ষমতায়, তাদের আশ্বাসে এই উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে।

১৯৭৮ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গেল। এদের একটি বিশাল অংশ কলকাতার ময়দান দখল করায় ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক কর্তৃপক্ষ এদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে। পুলিশ হঠাৎ অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার উদ্বাস্তুকে খড়্গপুরের ট্রেনে তুলে দেয়। আর একদিকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ইছামতী নদীর তীরে এসে জমায়েত হয়। তাদের লক্ষ্য বনবিভাগের বাগনা বিট অফিসের উলটোদিকে মরিচঝাঁপি দ্বীপ। অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে বুকে নিয়ে যে মরিচঝাঁপি এতদিন জনপদের বাইরে ছিল আজ সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতার কলরব। ফেলে আসা ঘরসংসার নতুন করে গড়ে তোলার এক অনন্য সংগ্রাম। এই হাজার কুড়ি মানুষ মেতে উঠেছে একটা বসতি গড়ার উৎসবে। ছেলে বুড়ো সবাই কাজ করছে, কোথাও নৌকো তৈরির কারখানা, কোথাও কামারশালা, চেরাই হচ্ছে কাঠের গুড়ি। এক পাশে বসেছে বাজার। তৈরি হয়েছে রাস্তা। চালা তৈরি করে বসিয়েছে স্কুল। পূজাপাঠের জন্য তৈরি হয়েছে ঠাকুরঘর।

মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সেহেতু সরকার মনে করে, ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইনের ২৪নং ধারা মরিচঝাঁপিতে প্রযোজ্য। ওই ধারা অনুযায়ী বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ ও অবস্থান করতে পারে না। সুতরাং একজন লোকও যদি বিনানুমতিতে মরিচঝাঁপিতে ঘোরাফেরা করে, তাহলে বন সংরক্ষণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকলে পাঁচজনের বেশি উদ্বাস্তুকেও তারা একজায়গায় পেলে গ্রেপ্তার করতে পারে।

মরিচঝাঁপিতে যখন পশ্চিমবঙ্গের সিপিআইএম সরকার বনভূমি রক্ষার কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগ করে প্রায় ৩০ হাজার উদ্বাস্তু মানুষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করল। সেই সময় সেই দ্বীপে উদ্বাস্তুদের আড়াই থেকে তিন হাজার শিশু ছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৭৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' ঘোষণা করেছিল। অথচ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ওই তিন হাজার শিশুর মুখের খাদ্য কেড়ে নিতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেননি। অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু হয়েছে শত শত শিশুর।

১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি আটঘাট বেঁধে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালাল বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই ঘটনা ছিল দু'দল মানুষের মধ্যে যুদ্ধ। একদল সরকার, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান।

সরকারের অর্থনৈতিক অবরোধ চলছে। সিপিআইএম এবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ বন্ধ করে দিল। মাদার টেরিজা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পিছিয়ে গেলেন— তিনি জানালেন, 'সাহায্য পাঠাতে না পারার জন্য দুঃখিত। কেন পাঠাতে পারছি না— এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

৬ মে ১৯৭৯-তে পুলিশ মরিচঝাঁপির স্কুলের দখল নিয়ে ক্যাম্প করে। তারপর শুরু হয় অপারেশন। উদ্বাস্তুদের নৌকা ভাঙা, খাদ্য লুঠ, ধর্ষণ শুরু হয়ে যায়। চলতে থাকে লঞ্চে তুলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা, পুরুষদের গ্রেপ্তার।

১৩ মে ১৯৭৯-এর মধ্যরাত্রে পুলিশ প্রথম অগ্নি সংযোগ করে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের তৈরি বাজারে। এরপর হাসপাতালে, স্কুলে। বেকারি, নৌকার কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর অগ্নিসংযোগ শুরু করল ঘুমন্ত মানুষের বাড়িগুলিতে। আগুনে পুড়ে আর পুলিশের গুলিতে ঠিক কত মানুষ মরেছে তার কোনো হিসেব নেই। আগুনের লেলিহান শিখা আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। অগ্নিদগ্ধ আর গুলিতে নিহত-আহত সবাইকে লঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল টাইগার প্রজেক্টে বাঘের খাদ্য হিসেবে। আহতেরা চিৎকার করে উঠেছিল 'আমরা বেঁচে আছি আমাদের বাঘের পেটে দিও না।' কিছু দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল মাঝ সমুদ্রে। এসব দৃশ্যের সাক্ষী ছিল অপর পারে কুমিরমারির মানুষেরা।

১৩, ১৪, ১৫ মে এক নাগাড়ে আক্রমণের পর মরিচঝাঁপিতে কান্নার রোল থেমে গেল। এসব ঘটনার বিবরণ দিতে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী কুমিরমারির মানুষদের চোখ আজও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। □

পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে : অনুপ্রবেশ, অরাজকতা ও সাংবিধানিক সংকট

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ আজ প্রশ্নের মুখে। এই প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক নয়; সামাজিক, সাংবিধানিক এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন ধরেই অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও প্রশাসনিক পক্ষপাতের অভিযোগে আলোচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই সমস্যাগুলি আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি ধারাবাহিক সংকটের রূপ নিয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে এক স্বাভাবিক প্রশ্ন দানা বাঁধছে— রাজ্যে কি এখনো ধারা ৩৫৫ বা ৩৫৬ প্রয়োগ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি?

১. **ধারা ৩৫৫ ও ৩৫৬ :** সংবিধান কী বলে?

ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা ৩৫৫ অনুযায়ী, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বহিরাগত আগ্রাসন থেকে রাজ্যকে রক্ষা করা কেন্দ্রের দায়িত্ব। অন্যদিকে ধারা ৩৫৬ বলছে, যদি কোনো রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত না হয়, তবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই ধারাগুলি কোনো রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়; এগুলি জাতীয় ঐক্য, আইনশৃঙ্খলা ও নাগরিক সুরক্ষার শেষ অবলম্বন।

২. **অনুপ্রবেশ :** সমস্যার মূল শিকড়। পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

অরক্ষিত সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী নজরদারির অবাব।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা।

ভোটব্যাংক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তন :

কয়েকটি জেলায় জনসংখ্যার চরিত্র বদলে যাওয়ার ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষার উপর চাপ। কর্মসংস্থানে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ। এই পরিস্থিতি কি কেবল একটি রাজ্যের সমস্যা, নাকি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন!— এই বিতর্ক আর এড়ানো যাচ্ছে না।

৩. **সাম্প্রদায়িক হিংসা ও প্রশাসনিক পক্ষপাত :**

একাধিকবার দেখা গেছে— নির্বাচনের পর হিংসা, হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা, পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ। যখন সাধারণ নাগরিক মনে করে— 'আইন আমার জন্য সমান নয়', তখন সেটাই প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্পষ্ট লক্ষণ।

৪. **রাজ্য সরকার কি সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে?**

ধারা ৩৫৬ প্রয়োগের মূল প্রশ্ন একটাই, রাজ্য সরকার কি সমবিধান অনুযায়ী শাসন চালাতে সক্ষম? যখন দেখা যায়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে বাধা, আদালতের নির্দেশ মানতে অনীহা, রাজনৈতিক ক্যাডার দ্বারা প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত, তখন প্রশ্ন ওঠে— এই শাসন কি সংবিধান সম্মত?

৫. **সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর :**

আজ পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ প্রকাশ্যে কথা বলতে ভয় পান— চাকরি যাবে, সামাজিক বয়কট হবে, হিংসার শিকার হতে হবে। ভয় যখন দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে যায়, তখন সেটি কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, গণতন্ত্রে সংকট।

৬. অনেকে প্রশ্ন করেন, কেন্দ্র সরকার হস্তক্ষেপ করছে না কেন?'

সম্ভবত কারণ— অতীতে ৩৫৬-এর অপব্যবহারের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা। কিন্তু প্রশ্ন হলো— ধৈর্য আর উদাসীনতার সীমারেখা কোথায়? যখন একটি রাজ্যে, নাগরিক নিরাপত্তা বিপন্ন, সীমান্ত ঝুঁকির মুখে, প্রশাসন দলীয় স্বার্থে বন্দি, তখন নীরবতা কি আদৌ ঠিক?

৭. **৩৫৫ প্রয়োগ :** প্রথম ও ন্যূনতম পদক্ষেপ—

ধারা ৩৪৬ নয়, প্রথমেই ধারা ৩৫৫ কার্যকর করা যেতে পারে— কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সীমান্তে কড়া নজরদারি, প্রশাসনিক সংস্কার, এটি রাজ্যের নির্বাচিত সরকার ভেঙে দেওয়া নয়, বরং রাজ্যকে সংবিধান রক্ষায় সহায়তা করা।

৮. **৩৪৬ :** শেষ অস্ত্র, কিন্তু নিষিদ্ধ নয়।

যদি, রাজ্য সরকার সহযোগিতা না করে, আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়, হিংসা ও অনুপ্রবেশ চলতেই থাকে, তবে ধারা ৩৫৬ আর 'রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত' নয়, বরং জাতীয় বাধ্যবাধকতা।

৯. **বঙ্গ বনাম বাঙ্গালি নয়, প্রশ্নটা নিরাপত্তার :**

এই আলোচনা বাঙ্গালির বিরুদ্ধে নয়, বঙ্গের পক্ষে। এই দাবি কোনো দলীয় রাজনীতির অংশ নয়, বরং— 'আমার ঘর নিরাপদ হোক, আমার পরিচয় অটুট থাকুক', এই ন্যায্য আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

১০. **ইতিহাস সাক্ষী :**

ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, সমস্যা অস্বীকার করলে তা বিস্ফোরিত হয়, ভোটব্যাংক রাজনীতি দেশকে দুর্বল করে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কি আমরা সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি চাই?

পশ্চিমবঙ্গ আজ জ্বলছে। এই জ্বালা শুধু আগুনের নয়, অবহেলার, ভয়ের, নিরাপত্তাহীনতার। ধারা ৩৫৫ বা ৩৫৬ কোনো জাদুকাঠি নয়, কিন্তু সংবিধানের দেওয়া শেষ রক্ষাকবচ। প্রশ্ন একটাই, কেন্দ্র কি নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব এড়াতে পারে? ▯

বসার অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ভারত

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

''তেমনি ফললাভের লোভের ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়।''— 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই বাক্যগুলি যেন চিরন্তন সত্য। বিভিন্ন দেশে বিগত বহু বছর ধরে সেই দড়ির বাঁধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সাক্ষী থেকেছে সমগ্র বিশ্ব। দড়ির বাঁধনের দ্বারা ঐক্য বিধানের ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়েছে প্রবুদ্ধ সমাজ। দড়িও ছিঁড়েছে মানুষের অধিকারবোধে। ভেঙে পড়েছে অচলায়তন। যেমন এবার দড়ি ছিঁড়ল '১০ মিনিট ডেলিভারি' ট্যাগের। সারা ভারত ব্যাপী শহরে, শহরতলিতে বাইক দুর্ঘটনা হয়তো খুব কমই সংবাদ শিরোনামে আসে। দুর্ঘটনার শিকার হন কোনো হতভাগ্য বাইক বা স্কুটার চালক। মাঝেমধ্যে জানা যায় যে, বাইকের পিঠে চেপে ঝড়ের গতিতে সুস্বাদু, গরম খাবার সরবরাহ করতে ছুটছিলেন সেই তরুণ। কখনও খবর আসে যে, তড়িৎ গতিতে খাবার দিতে যাওয়ার সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় ছিটকে বিদ্যুতের তারে আটকে, কোটি টাকার দামি গাড়ির তলায় পিষ্ট ডেলিভারির বাইক। এতদিন ধরে এতকিছু ঘটে যাওয়ার পর অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত— '১০ মিনিটে ডেলিভারি বন্ধ হোক'। একটু দেরীতে কার্যকর হলেও এই সিদ্ধান্তকে কিন্তু সাধুবাদ জানাতেই হবে। দাবি আদায়ে ডেলিভারি পার্সনদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে শেষমেশ বন্ধ হলো এই প্রথা।

যতক্ষণ না কোনো পেশাদারিত্বের বিষয় 'অমানবিক' বলে প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সেটিকে কেবলমাত্রই শ্রম পরিষেবা হিসেবে গণ্য করার একটা মারাত্মক বদভ্যাস যেন অনেকের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। '১০ মিনিটে হোম ডেলিভারি' যখন বন্ধ হচ্ছে তখন মনে পড়ল পাহাড়ের একটি ঘটনা। উঁচু পাহাড়ে ভ্রমণকালীন এই লেখিকার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল একবার। পাহাড়ের বাঁকে ভারি আন্তরিকতার সঙ্গে এক ভদ্রলোক টুকটাক নানা খাবার প্রস্তুত করছেন পথিকদের জন্য। অগত্যা তার কাছেই 'টেন মিনিট নুডলস্' চাইতে হলো। দেখলাম নুডলস্ রান্না হচ্ছে, কিন্তু দেরি হচ্ছে। ক্ষিদেতে তো তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। ছটফটে মুখটা দেখে ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে পাহাড়ি সুরেলা বাচনশৈলীতে বললেন, 'প্যাকেটে লেখা রয়েছে ১০ মিনিট, তা কি আর হয় বেটি!' আজ বড্ড প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে তাঁর বলা সেই কথাগুলো। সত্যিইতো, ১০ মিনিটে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ব্যতীত আর কি সত্যিই কিছু হয়? পেশাদারিত্বের বিচার হবে ১০ মিনিটে কে এলো এবং কে এলো না-র দ্বারা? ১০ মিনিটে কি অ্যাম্বুলেন্স আসে? কেউ বিপদে পড়লে ১০ মিনিটে পুলিশ আসবে? ১০ মিনিটে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি আসে? আসা সম্ভব? কিন্তু ১০ মিনিটে বহুজাতিক সংস্থার খাবারের ডেলিভারিটা চাই। আপাতত তাতে পূর্ণচ্ছেদ এবং আংশিক স্বস্তি।

'আংশিক স্বস্তি' কারণ, কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হচ্ছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রম সংক্রান্ত সুরক্ষার বিষয়ে। তা হলো বসার অধিকার বা রাইট টু সিট। বহুজাতিক সংস্থার শো-রুমে, শপিং কমপ্লেক্সে গ্রাহক বা ক্রেতারা যখন যান, তখন তাঁরা দেখেন যে ঝাঁ চকচকে চারদিক। নিশ্চিতভাবে এই দৃশ্য বিশেষ সুখদায়ী। কিন্তু যাঁরা সেখানে ক্রেতাদের পরিষেবা দিচ্ছেন, যাঁরা বিলিং কাউন্টারে দায়িত্ব পালন করছেন, যাঁরা পণ্য বিক্রিতে ক্রেতাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেন, গ্রাহকদের সহযোগিতা করছেন নানান ভাবে, তাঁদের একশব্দে 'সেলস্ পার্সন' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তাঁরা কর্তব্যরত অবস্থায় থাকাকালীন একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। ডিউটি জয়েন করতে তাঁরা যখন স্টোরে ঢোকেন, তখন থেকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে জুড়ে যায় আরও একটি বাড়তি শ্রম— তা হলো ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকা। নিশ্চিতভাবে এটিও এক অমানবিক, কষ্টকর ও ভিত্তিহীন পেশাদারিত্ব। যখন তাঁরা ক্রেতার সম্মুখে থাকেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিষেবা দেন, এটা স্বাভাবিক যে তখন তাঁরা দাঁড়িয়েই থাকবেন। কিন্তু যখন তা করতে হচ্ছে না, তখনও একজন কর্মচারী বসবেন না— এই ব্যবস্থার নিন্দা তো করতেই হয়। অধিকাংশ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শো-রুমে দেখা যায় কর্মচারীদের বসার ন্যূনতম ব্যবস্থাটাই নেই।

অনেক বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা নির্মিত ও পরিচালিত পণ্য বিপণী বা শপিং মলে উচ্চবিত্তরাই সাধারণত যান, স্বাভাবিকভাবে ক্রেতাদের ভিড় সেখানে বেশ কম। সেখানেও ঝাঁ চকচকে পোশাক পরিহিত সেলস্ পার্সনদের সারাদিন দাঁড়িয়েই থাকতে দেখা যায়। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকার

পরেও কর্পোরেট হাসি হেসে ক্রেতাদের সঙ্গে পেশাদার ভঙ্গিতে কথা বলতে হয়।

এ কেমন ভোগবাদে আচ্ছন্ন হচ্ছে আজ গোটা মানবসমাজ, যেখানে জনসাধারণের মানবাধিকার লুণ্ঠিত আর তারই নাম হচ্ছে 'পেশাদারিত্ব'! সময় এসেছে এই ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধের। এই অমানবিকতা রুখতে আইন প্রণয়ন হোক কেন্দ্রীয় স্তরে, অথবা জারি হোক কেন্দ্রীয় নির্দেশ। বসার অধিকার থাকুক সবার। কর্তব্যরত অবস্থার ফাঁকে বসার অধিকারের দাবিতে সাম্প্রতিক অতীতে দীর্ঘ লড়াই চলে তামিলনাড়ুতে। এর আগে 'রাইট টু সিট' আন্দোলন শুরু হয় কেরালায়। ২০১৮ সালে কেরালায় এই আন্দোলন সংঘটিত হলেও অবাক করার মতো বিষয় হলো যে, এই শ্রম আইনটি কেরালা বিধানসভায় পাশ হয়েছিল ১৯৬০ সালে। কেরালার বুকে তা ছিল এক যুগান্তকারী আইনি সংস্কার। 'দ্য কেরালা শপস্ অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৬০' সুনিশ্চিত করে প্রত্যেক বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সকল কর্মচারীর জন্য বসার যথেষ্ট ও যথাযথ ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক। অথচ সেই রাজ্যে এমন একটি শ্রম আইন থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্তব্যরত কর্মীদের, বিশেষত মহিলা কর্মীদের এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ শুরু হলো ২০১২ সাল থেকে। এই অসম্মানের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদমুখর হলেন। মাথা হেঁট করে কাজ করার বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবি আদায়ে তাঁরা রীতিমতো সোচ্চার হলেন। ২০১২ সালে কেরালায় শুরু হলো পেনকোট্টু আন্দোলন। শেষমেশ তাঁদের দাবি মানতে বাধ্য হলো কেরালা সরকার। সব খুচরো, পাইকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শো-রুমে কর্মীদের বসার বন্দোবস্ত হলো। আইন অনুযায়ী, যে মালিক এই ক্ষেত্রে গড়িমসি করবে, তার হবে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা। এই রেশ ধরে ২০২১-এ তামিলনাড়ুতেও শুরু হলো 'রাইট টু সিট' মুভমেন্ট। সেখানেও উল্লেখিত হলো ১৯৬০ সালে কেরালায় প্রণীত আইনটি। আন্দোলনের ফলে তামিলনাড়ুতে প্রণীত আইনের ২১(খ)-ধারায় উল্লেখিত হয়েছে, ''In every shop and establishment, suitable arrangements for sitting shall be provided for all workers so as to avoid 'on the toes' situation throughout the duty time, so that many take advantage of any opportunity to sit which may occur during the course of their work.''। আজকে ভারত ব্যাপী যত ঝাঁ চকচকে পণ্য বিপণী রয়েছে, সর্বত্র ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই চিন্তা। সেটা হলো— কর্তব্যরত অবস্থায় সারাদিন ধরে 'on the toes' থাকার নিয়মটি কখনোই একজন কর্মীর প্রতি সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্মান প্রদর্শন হতে পারে না। আজকে কর্মীমহলে এহেন সচেতনতার দরুন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষত উন্নত দেশগুলির সর্বত্র— এই সেক্টরগুলিতে কর্মরতদের ক্ষেত্রে 'রাইট টু সিট' বা বসবার অধিকার উপস্থিত।

জার্মানি, সুইডেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা, ইউ কে— সর্বত্র কর্মীরা কর্মস্থলে বসার অধিকার রাখেন। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আইএলও-র 'হাইজিন (কমার্স অ্যান্ড অফিসেস) কনভেনশন, ১৯৬৪'-র ১২০ নং ধারা অনুসরণ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মোট ৫২টি দেশ ২০২৩ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষর করল, সেখানেও এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে— 'Suitable seats and reasonable opportunities for workers to use them.'। আজকে ভেনেজুয়েলা, ইরান, গ্রিনল্যান্ড, কানাডা-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাত বাড়ানো সর্বগ্রাসী আমেরিকাতে কিন্তু কার্যকর নয় 'রাইট টু সিট'। ভারতের মতো সহনশীল, স্থিতিস্থাপক, উদারতান্ত্রিক দেশে যদি এই বিষয়টিকে আইনগতভাবে নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে তা হবে ভারতের 'স্থিরসুখমাসনম্' বোধমন্ত্রের ওপর এক আঘাত। কর্মীদের প্রতি আচরণের অমানবিক সংকীর্ণতার প্রেক্ষিতে তাহলে তো এক হয়ে যাবে আমেরিকা ও ভারত। ভারতে স্ত্রী জাতির জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছে, 'আসীনো ভব'। এমন কথা কোথাও বলা হচ্ছে না যে, শো-রুমে একজন মহিলা কর্মী কর্তব্যরত অবস্থায় সবসময় বসেই থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়াসী, কর্মযোগী, শ্রমপ্রিয় নারীরা তা পছন্দই করবেন না। কিন্তু তাঁর কোনো শারীরবৃত্তীয় সমস্যা উপস্থিত হলেও কর্মস্থলের নিয়মের কারণে তিনি সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকবেন, অথবা শো-রুমে ক্রেতারা অনুপস্থিত থাকলেও তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন— এহেন দৃশ্যপট চূড়ান্ত অমানবিক।

বৈদিক মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে— 'উপবিশ্য'। বসলে কিন্তু কাজের মান বাড়ে। দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কোনো বাড়তি পেশাদারিত্ব কিন্তু নেই, বরং কর্মচারীদের স্বাস্থ্য অবনতির সম্ভাবনা এবং অস্থি ও অস্থিসন্ধিজনিত সমস্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনো দপ্তরে পরিষেবার জন্য গিয়ে সেখানে কর্মসংস্কৃতির অভাবের কারণে পরিষেবা না পেয়ে অনেকেই হতাশ বা বিরক্ত হয়ে ফিরে আসেন; কোথাও কিন্তু কর্মচারীদের দাঁড়িয়ে পরিষেবা দিতে কেউ দেখেন না। তাই কেবলমাত্র বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত সেলস্ পার্সনদের জন্য এই শাস্তি কেন? ভারত সরকারের 'দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ্ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন্স (ওএসএইচ) কোড, ২০২০'-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে, 'Safeguarding worker rights and safe working conditions and creating a business-friendly regulatory environment spur economic growth and employment thereby, making India's labour market more efficient, fair and future ready.'। অতএব, কর্মক্ষেত্রের নিয়মানুযায়ী কর্মচারীর যে অভ্যাস বা করণীয় কাজ অর্থাৎ একনাগাড়ে দিনভর দাঁড়ানো, তা তো ওয়ার্কার্স রাইট বা কর্মীদের অধিকারের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। ন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ্ বোর্ডের উচিত প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দেওয়া যাতে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মক্ষেত্রে সবার জন্য বসার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। সবার বসবার জন্য যেন সুনির্দিষ্ট, যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস'-এ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে ভারত, কিন্তু কর্মীদের প্রতি নিয়োগকারী সংস্থাগুলির আচরণবোধে উন্নত দর্শনের প্রয়োগ দেশে সামাজিক সুরক্ষা ও ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে।

ঐশ্বর্যপুরীতে যখন উচ্চবিত্তরা প্রবেশ করেন, মানবিক দিকগুলোর প্রতি তখন হয়তো তাদের ভ্রূক্ষেপ থাকে না। ১০ মিনিটে হোম ডেলিভারি যদি বন্ধ হয়, গিগ কর্মীদের জন্য পেশাগত সুরক্ষা যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে বসবার অধিকারের অপেক্ষায় আর কেন অসংখ্য কর্মীকে অনির্দিষ্টকাল দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? সম্ভাবনার কল্পনাকে বাস্তবায়ন ভারতের গৌরববৃদ্ধি ঘটিয়েছে। প্রমাণ হয়েছে যে, ভারতবর্ষ যা ভাবে তা করেও। উদীয়মান ভারত যদি নির্মাণ করতে হয়, তবে মনে রাখতে হবে যে উন্নত শ্রম সংস্কৃতিটাও কিন্তু মাত্র ১০ মিনিট দূরত্বেই দাঁড়িয়ে। নতুন ভারতে সকলের জন্য নিশ্চিত হোক বসার অধিকার। □

ইঁদুরের হিরে চুরি

একটি ইঁদুর খাবার খুঁজতে খুঁজতে এক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে। কোনোরকম খাবার না পেয়ে এক সময় ইঁদুরটি খাদ্য ভেবে একটি হিরের টুকরো খেয়ে ফেলে। একটি দামি হিরে চুরি যাওয়া ফলে রাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সবার ঘুম উবে গেল। রাজামশাই জরুরি সভা ডেকে আলোচনায় বসলেন। অনেক আলোচনার পরও হিরেটির কেউ কোনো হদিশ দিতে পারল না।

শেষে রাজজ্যোতিষীকে ডেকে আনা হলো। জ্যোতিষী অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, হিরের টুকরো অন্য কেউ চুরি করেনি, কোনো ইঁদুর খেয়ে ফেলেছে।

সেনাপতি হিরে উদ্ধারের জন্য সারা রাজ্যে পুরস্কার ঘোষণা করে দিলেন। বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেল কেউ হিরের সন্ধান দিতে পারল না। শেষে এক চৌকস শিকারিকে ইঁদুর মেরে হিরে উদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। শিকারি ইঁদুর মারার জন্য ইঁদুরের বাসার সন্ধান করে বেড়াতে লাগল। একদিন রাজপ্রাসাদের একটু দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ইঁদুরের আস্তানায় পৌঁছল, দেখল শত শত ইঁদুর দল বেঁধে শুয়ে আছে। কিন্তু একটি ইঁদুর অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে একটি ইটের উপরে রঙিন কাপড়ের বিছানা তৈরি করে আরাম করে শুয়ে আছে।

শিকারি তখন দেরি না করে ওই ইঁদুরটাকে ধরে মেরে তার পেট চিরে হিরেটি বের করে নিল। তারপর রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে রাজার হাতে সেটা তুলে দিল।

রাজামশাই তো বিস্মিত। শিকারিকে তার প্রাপ্য পুরস্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অসংখ্য ইঁদুরের মধ্যে তুমি কী করে বুঝলে যে সেই ইঁদুটিই হিরে খেয়ে ফেলেছে?

শিকারি মৃদু হেসে জবাব দিল, মহারাজ, এটা বোঝা খুবই সহজ যে মূর্খরা হঠাৎ বিত্তবান হলে তারা নিজেদের অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে। এমনকী নিজের গোত্র ও জাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। মূর্খ ইঁদুটিও তাই-ই করেছিল। হিরে চুরি করে নিজেকে সবচেয়ে ধনী এবং ইঁদুরদের রাজা মনে করেছিল। তাই সে আলাদা ও একটু উঁচুতে থাকতে শুরু করেছিল। সেজন্য তাকে সহজেই চিহ্নিত করা গেছে।

ছোটো বন্ধুরা, আমাদের চারপাশেও এমন মানুষদের দেখা যায়, যাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন এসে গেছে। বড়ো বড়ো মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করলে অথবা কিছু টাকাপয়সা হাতে এসে গেলেও তাদের মন যে ছোটোই রয়ে গেছে, তা তারা বেমালুম ভুলে যায়।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

গ্রেট হিমালয়ান পার্ক

গ্রেট হিমালয়ান পার্ক হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় অবস্থিত। ১৯৮৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৯ সালে জাতীয় উদ্যান ঘোষিত হয়। পার্কটি ১১৭১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং উচ্চতা ১৫০০ থেকে ৬০০০ মিটারের মধ্যে। ২০১৪ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়। এখানে ৩৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, ১৮১ প্রজাতির পাখি, ৩ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১২৭ প্রজাতির পোকামাকড়ের আবাসস্থল। এখানে কোনো রকমের শিকার অনুমোদিত নয়। এখান থেকেই দর্শন করা যায় হাদিম্বা মন্দির. রাহাল্লা জলপ্রপাত, মানালি গোম্ফা, বশিষ্ঠ মন্দির, জগৎসুখ মন্দির, সোলং ভ্যালি, মনু মন্দির, মানালি অভয়ারণ্য, রঘুনাথ মন্দির, বাশেশ্বর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯৮

पञ्चमी विभक्तिः (भागः - १)

इतः -तत्र । ततः - अत्र

(এখান থেকে – সেখানে। সেখান থেকে – এখানে)

बालकः इतः तत्र गच्छति।

বালকটি এখানে থেকে সেখানে যায়।

अहं इतः तत्र गच्छामि।

भवान् ततः अत्र आगच्छति ?

का ततः अत्र आागच्छति ?

प्रयोगं कुर्मः -

कः,इतः,तत्र, ततः,अत्र, आगच्छति, गच्छति--

तादृशानि वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः वा ?

যোগাযোগ–

(১) শ্রী সন্তু দত্ত, সংস্কৃতভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক।

৯৮৭৪৬৮০৩১৩।

(২) শ্রীজয় সাহা,সংস্কৃতভারতী, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক।

৭৫০১৪৩৮৯৪৯।

ভালো কথা

আমার দেওঘর ভ্রমণ

গত ১৯ ডিসেম্বর আমাদের পরিবারের ১৪ জন দুটি গাড়িতে প্রথমে নবদ্বীপ ধাম যাই। সারাদিন নবদ্বীপ ধাম দর্শন করে পরদিন ২১ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের উদ্দেশে যাত্রা করি। মাঝে দুমকাতে আমরা সকালের জলখাবার সেরে নিই। তারপর আমরা বাবা বসুকীনাথ মন্দির দর্শন করি। ঝাড়খণ্ড কয়লার জন্য বিখ্যাত। মন্দিরটি কয়লাখনির পাশেই অবস্থিত। তারপর রওনা হয়ে রাস্তার পাশে একটি বড়ো পাহাড়ের উপর ত্রিকুট মন্দির দেখতে পেলাম। সেখানেই একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়াদাওয়া হলো। তিনটি চূড়ার জন্য এর নাম ত্রিকুট পাহাড়। মনে হচ্ছিল পাহাড়ের চূড়াটি মেঘ স্পর্শ করেছে। আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম। নীচের পার্কেও আমরা ভাই-বোনেরা মিলে খুব মজা করেছি। তারপর শ্রী নির্মল দেওঘর হোটেলে ব্যাগপত্র রেখে আমরা বাবা বৈদ্যনাথ মন্দির দর্শন করলাম। পরদিন আবার মন্দিরে গিয়ে ভগবান শিব আর মা পার্বতীর আশীর্বাদ নিয়ে তপোবন পাহাড়ে গিয়ে চূড়ায় উঠলাম। তারপরে রওনা দিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি পৌছালাম।

নিরভ্র নাথ, অষ্টমশ্রেণী, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, কল-৫৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীত

কার্তিক কুমার, ষষ্ঠশ্রেণী, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া।

এত শীত দেখি নাই
এত মজা পাই নাই,
ঠাণ্ডায় জমে যাই
সারাদিনে রোদ নাই।
সকাল সন্ধ্যে জ্বালিয়ে আগুন
গা গরম করি আর পোড়াই বেগুন,
ছোটো বড়ো সবাই আগুন পোহাই
আর রুটির সাথে বেগুনপোড়া খাই।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

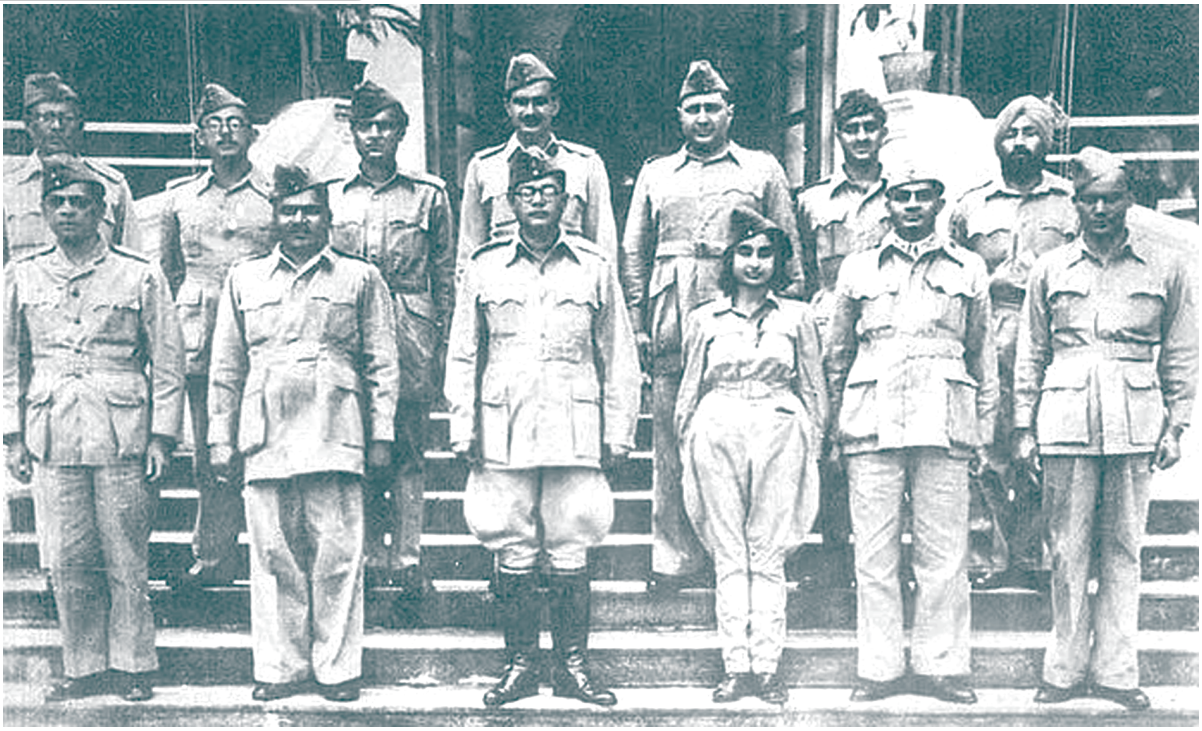

নেতাজীই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

কিশোর বর্মন

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস বইয়ে 'জওহরলাল নেহরু' লেখা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস শুধু বই নয়, ইতিহাস বিবেকও। আর সেই বিবেক আজও প্রশ্ন তোলে— কে পরাধীন ভারতে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেছিলেন? আর তার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর একটাই— নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি খণ্ডিত ভারতের শাসন কাঠামো হাতে পান— ব্রিটিশ-ভারত প্রশাসন, সিভিল সার্ভিস, সীমান্ত, রাজধানী সবকিছু। কিন্তু চার বছর আগে, ২১ অক্টোবর ১৯৪৩-এ, সিঙ্গাপুরে যা ঘটেছিল, তা ছিল ভারতের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়— সেটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সরকার। নেতাজী ছিলেন সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও সেনা-সর্বাধিনায়ক। এটি কোনো প্রতীকী ছায়া-সরকার ছিল না। জাপান, জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া-সহ বিভিন্ন দেশের মোট ১১টি সরকার নেতাজী প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাস্তবে একটি পূর্ণাঙ্গ দেশ পরিচালনার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন— ক্ষমতা পাওয়ার অপেক্ষায় নয়, দেশ গঠনের দৃঢ় সংকল্পে।

জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল। এর আগে তিনি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ থেকে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের ডি-ফ্যাক্টো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যদিও তার পদমর্যাদাটি ছিল— ভাইসরয়ের অধীনস্থ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। কীভাবে নেহরু এই পদে আসীন হন? ১৯৪৬ সালের ভারত জুড়ে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সম্মত হয়। কংগ্রেসের তরফে প্রধানমন্ত্রী বেছে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে। তখন কংগ্রেসের ভেতরে নেতা নির্বাচনের জন্য একটি ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আসলে কার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল? সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য খুব স্পষ্ট— কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন (১৯৪৬)। কংগ্রেসের ১৫টি প্রাদেশিক কমিটি ছিল। ১৪টি প্রাদেশিক কমিটি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্দার প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করে। একটিও নেহরুর পক্ষে আসেনি। অর্থাৎ কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী সর্দার প্যাটেলই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল।

তাহলে নেহরু প্রধানমন্ত্রী হলেন কেন? এখানে আসে গান্ধীজীর ভূমিকা। গান্ধীজী মনে করতেন নেহরু আন্তর্জাতিক মহলে বেশি গ্রহণযোগ্য। যুবসমাজে জনপ্রিয়। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ। গান্ধীজীর কথায় সর্দার প্যাটেল নিজেই নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। প্যাটেল বলেছিলেন— 'গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যাব না।' এর ফলেই জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নেতা নির্বাচিত হন এবং পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। সংক্ষেপে বললে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন জওহরলাল নেহরু। এটি এক প্রকার জালিয়াতি।

নেহরু যেখানে স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার নেতৃত্ব পান, নেতাজী সেখানে স্বাধীনতার আগেই দেশ পরিচালনার বাস্তব রূপরেখা তৈরি করেন। নেহরু রাজক্ষমতা পান ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে। নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তিতে। এই তথ্য প্রমাণ করে— নেতাজী কেবল স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা নন, তিনি ছিলেন বাস্তব দেশ পরিচালনার অভিজ্ঞ নেতা। এখানেই নেতাজীর সঙ্গে নেহরুর মৌলিক পার্থক্য। এই পার্থক্যই পরবর্তীকালে দেশের শাসন পরিচালনার ভিন্ন পথ নির্ধারণ করে।

ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশ চিন্তা আজ আর একরৈখিক নয়। এটি তিনটি ভিন্ন দর্শনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত—

১. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : অখণ্ড ভারতের পূজারি। শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি তথা দেশ গঠনে বদ্ধপরিকর।

২. জওহরলাল নেহরু : পরিবারবাদ ও আপোশমূলক কূটনীতিতে বিশ্বাসী।

৩. নরেন্দ্র মোদী : বাস্তববাদী, রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধহস্ত।

এখন প্রশ্ন তোলা যায়— নরেন্দ্র মোদীর শাসন কি নেতাজীর অসমাপ্ত কাজের বাস্তবায়ন? উত্তর, হ্যাঁ।

নেতাজীর স্বদেশ দর্শন ছিল স্পষ্ট— সার্বভৌমত্বের বিষয়ে আপোশ নয়। দেশ শক্তিশালী না হলে স্বাধীনতা টেকে না। ফলে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি হয়েও তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে আবেদন নিবেদন নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম।

নেহরুর দর্শন ছিল ভিন্ন— আপোশমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদ। ব্যক্তিগত অবস্থানের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। এর ফল দেখেছে দেশবাসী। কাশ্মীর সমস্যাকে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যাওয়া— ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় আন্তর্জাতিক বিতর্কে পরিণত করার মতো ভুল তিনি করেছিলেন।

নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকারের সিদ্ধান্তে— ২০১৯ সালে কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ ঘটে। কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রশাসনিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়— নেতাজীর 'Decisive State'-এর ধারণা মোদীজীর শাসনে বাস্তব রূপ পায়, যা নেহরু যুগে অকল্পনীয় ছিল।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় অবস্থান— নেতাজীর বৈশ্বিক কূটনীতি। নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান (১৯৪৩)। জাপান, জার্মানি-সহ ১১টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করেন। তিনি স্বাধীনতা ভিক্ষা চাননি, ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

নেহরু ছিলেন Non-Aligned Movement বা নির্জোট কূটনীতির প্রবর্তক। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য সমর্থন দান করেন তিনি। কিন্তু বিনিময়ে সীমান্ত নিরাপত্তা বা কূটনৈতিক নিশ্চয়তা পাননি। ফল হলো— ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধ। ভারতের কৌশলগত পরাজয় ও আকসাই চীন বেদখল।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃত্বে ভারত লাভ করে— জি-২০-র সভাপতিত্ব; QUAD-এর সদস্যপদ অর্জনের পাশাপাশি গ্রহণ করে Indo-Pacific কৌশল। এছাড়াও ভারতের পক্ষ থেকে সামনে আসে 'India First'-ভিত্তিক কূটনীতি। এগুলি নেতাজীর স্বদেশ চিন্তার প্রতিফলন— 'বিশ্বমঞ্চে সম্মান অর্জিত হয় শক্ত অবস্থান থেকে, ফাঁকা বক্তৃতা থেকে নয়।'

সামরিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। সর্বপন্থনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী। ছিল নারী সেনাবাহিনী।

নেহরু যুগে— সামরিক প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে সেনাবাহিনীর মূল্যায়ন উপেক্ষিত হয়। ফল : ১৯৬২ সালের বিপর্যয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় বাস্তবায়িত হয়— One Rank One Pension প্রকল্প। অর্জিত হয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা। ভারতবাসী দেখেছে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের প্রত্যুত্তরে Surgical Strike, Balakot Air Strike। সুতরাং দেশের শক্ত কাঠামো— যা নেতাজীর স্বপ্ন ছিল— তা কার্যত মোদী আমলেই বাস্তবায়ন।

অখণ্ড ভারত ও দেশভাগ প্রসঙ্গে নেতাজী ছিলেন আপোশহীন। ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজনের ঘোর বিরোধী। তিনি অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা।

আর নেহরু ১৯৪৬-৪৭ সালে দেশভাগকে অনিবার্য বলে মেনে নেন। মুসলমানদের দ্বারা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-র সংঘটিত হওয়ার পরেও তার পক্ষ থেকে ছিল কঠোর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার অভাব। ফল : লক্ষাধিক প্রাণহানি, স্থায়ী শত্রুতা।

নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি— 'এক দেশ, এক আইন'। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে দেশ। এটি নেতাজীর স্বদেশভাবনার সরাসরি প্রতিফলন। একই সঙ্গে— নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার। দিল্লির রাজপথে নেতাজীর মূর্তি স্থাপন-সহ আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার কাজ করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

মোদীজীর শাসন পরিচালনায় পাওয়া যায় নেতাজীর দর্শনের প্রতিফলন। ইতিহাস বদলানো যায় না কিন্তু ইতিহাসের ভুল সংশোধন করা যায়। নেতাজী ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী— দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত ভারত সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। দেশ বিভাজন মেনে নিয়ে নেহরু খণ্ডিত দেশ পেলেন কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন নেতাজী। আর আজ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত নেতাজীর সেই ভাবনার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে— যেখানে ক্ষমতা নয়, দেশের শক্তি ও সার্বভৌমত্বই মুখ্য।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এক শক্তিশালী রাষ্ট্রভাবনার রাষ্ট্রনায়ক। এর বিপ্রতীপে নেহরু ছিলেন নীতিপঙ্গুত্বে আচ্ছন্ন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতাজীর রাষ্ট্রভাবনাকে আধুনিক বাস্তবতার রূপ দিয়ে চলেছেন। আজকের ভারত তাই কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নয়— বরং এক ঐতিহাসিক সংশোধনের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। নেতাজীর অসমাপ্ত স্বপ্ন— আজ নরেন্দ্র মেদীর নেতৃত্বে বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। যা নেতাজী দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলে বহু আগেই হয়তো বাস্তবায়িত হতো। আর দেশের ইতিহাসও অন্যরকম হতো।

[লেখক ত্রিপুরা সরকারের উচ্চশিক্ষা, পঞ্চায়েত সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের মন্ত্রী]

যারা নীরবে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে গিয়েছেন, তাদের কয়েকজন

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথমে আলোচনা করা যাক ৫৯, সুকিয়া স্ট্রিটের বিখ্যাত দত্তবংশের প্রমথনাথ দত্তের কথা। ইনি বিপ্লবী সমিতিতে প্রথম দিকেই নাম লিখিয়েছিলেন। বড় আশ্চর্য এঁর জীবনকথা। সমিতির কাজ করতে করতে, ১৯০৬ সালে প্রমথনাথ বন্ধু ফকিরচন্দ্র পালের সঙ্গে আমেরিকায় চলে যান— উদ্দেশ্য সামরিক বিদ্যা শিক্ষা। কিন্তু আমেরিকায় সুবিধা না হওয়ায় ১৯০৯ সালে প্যারিস। ওই শহরের ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তায় ফরাসি সরকারের বিদেশি সিপাহিদের পলটনে ছদ্মবেশে ভর্তি হয়ে যান। লড়াই শেখবার এমনই জেদ! তাকে পাঠানো হয় ফরাসি আফ্রিকায়। এক পাহাড়ের পাদদেশে সেই পলটনের তাঁবু। সেইখান থেকে প্রমথ চিঠি লিখেছেন ভূপেন্দ্রনাথকে। এর পরে ফরাসি অধিকৃত সায়গন শহরে পাঠানো হয় প্রমথদের সেনাদলকে। সায়গনে গিয়েও ভারতের স্বাধীনতার কথা ভুলতে পারছেন না প্রমথ।

পাঁচ বছর বাদে সৈনিক জীবনের চুক্তি শেষ হলে উনি প্যারিসে চলে আসেন। নন-কমিশনড্ অফিসারের পদ। চেষ্টা করলেই উনি কমিশনড্ অফিসার হতে পারতেন। হননি। উনি তো পদের জন্য সেনাবাহিনীতে ঢোকেননি, সামরিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য যোগ দিয়েছিলেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর আর সম্মাননীয় পদ তাঁর দরকার নেই। এক তুর্কি ভদ্রলোকের সহায়তায় প্রমথ চলে যান কন্সটান্টিনোপল। উদ্দেশ্য ইংরেজ গভর্নমেন্ট বিরোধী পত্রিকা প্রকাশ। এ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগের ঘটনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত পত্রিকা বের করা যায়নি। এই সময়েই 'জেহানে ইসলাম' পত্রিকা সম্পাদক আবু সৈয়দের সঙ্গে আলাপ প্রমথের। তাঁরই অতিথি হিসাবে ছিলেন কিছুদিন। এ সময় প্রমথের নতুন পরিচিতি হয় দাউদ আলি দত্ত হিসাবে। এই নামেই তিনি ভারত মুক্তির জন্য নানান বৈপ্লবিক কাজ করে যেতে থাকেন। যোগাযোগ হয় নাগপুরের পাণ্ডুরঙ্গ খানাখোজের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রমথনাথ আর পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব খানখোজে আমেরিকা থেকে আসা গদর পার্টির বিপ্লবী আর মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী থেকে পলাতক কিংবা বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক মুক্তিবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। লক্ষ্য, ইরান ও বালুচিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ। ইংরেজরা যখন শিরাজ শহর আক্রমণ করে তখন তাঁর পায়ে গুলি লাগে। সেই থেকে ক্রাচ নিয়েই হাঁটতে হয়। প্রমথ ও খানখোজে একাধিকবার ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন, কিন্তু প্রতিবারই পালাতে সক্ষম হন। না হলে অন্যান্য বন্দিদের মতো তাকেও গুলি করে মারা হত।

১৯২১ সালে একদল ভারতীয় বিপ্লবী যখন মস্কোতে, খবর পাওয়া যায়, ইংরেজ আক্রমণের মুখে প্রমথ ইরানে এক পাহাড়ি জনজাতির মধ্যে লুকিয়ে আছেন। তাকে উদ্ধার করবার জন্য মস্কোর ফরেন অফিসকে অনুরোধ জানান বিপ্লবীরা। মাস তিনেকের মধ্যে প্রমথকে উদ্ধার করে মস্কো নিয়ে আসা হয়। লেনিনের নির্দেশে তখন লেনিনগ্রাডের ইনস্টিটিউট ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে আধুনিক ভারতীয় ভাষা শেখাবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রথম যে ভারতীয় ভাষা শেখানো শুরু হয়, তা হল বাংলা, আর তার প্রথম শিক্ষক প্রমথনাথ ওরফে দাউদ আলি দত্ত। এই নামেই তিনি সোভিয়েত দেশে বেশি পরিচিত ছিলেন। বাংলার সঙ্গে তিনি হিন্দি ও উর্দুও পড়াতেন। জীবনের শেষ অবধি প্রমথ রাশিয়াতেই ছিলেন। আজীবন বিপ্লবী, ইংরেজ বিরোধী এই মানুষটিকেই-বা আজ ক'জন মনে রেখেছি?

১৯০৪ সালে বঙ্গের বৈপ্লবিকদের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবব্রত বসুও আজ বিস্মৃতপ্রায়। দেবব্রত একই সঙ্গে ব্যায়ামপটু, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। যখন প্রমথনাথ মিত্র (পি মিত্র) বঙ্গের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট, তখন ব্যবস্থা এইরকম—মফস্সল শাখাসমিতি থেকে কেউ কলকাতায় এলে প্রথমে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা করে প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিতে হবে। তেমন প্রয়োজন বুঝলে তবেই দেবব্রত যোগাযোগ করিয়ে দেবেন পি মিত্রের সঙ্গে।

মন্মথ চ্যাটার্জির টাউন স্কুলে শিক্ষকতা করা দেবব্রত ভূপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার, অবিনাশদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিলেন, প্রকাশিত হয়েছিল বিপ্লবীদের পত্রিকা 'যুগান্তর'। এই পত্রিকায় তিনি যোগাক্ষ্যাপা ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতেন, অতীব জ্বালাময়ী সব লেখা। কতবার যে রাজদ্রোহের মামলা হলো যুগান্তরের বিরুদ্ধে। মনোরঞ্জন গুহের 'নবশক্তি' কাগজেও লেখক হিসাবে চাকরি নিয়েছিলেন দেবব্রত। নবশক্তির কাজকর্ম যে বাড়ি থেকে চলত তারই একটি ঘর ভাড়া নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ থাকতেন। মানিকতলার বোমা মামলার তদন্তে ১৯০৮ সালের ২ মে এই ঘর থেকেই গ্রেপ্তার হন শ্রীঅরবিন্দ। দু-দিন পরে দেবব্রতকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এক বছর তিনি জেলে ছিলেন। ছাড়া পাবার পর বেলুড় মঠে যোগ দেন, নাম হয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

দেবব্রত ছিলেন অসামান্য গায়ক, গান রচনাতেও তার অসাধারণ ক্ষমতা। একবার সতীর্থ রঘুনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে তিনি বিপ্লবের প্রচারের জন্য ওড়িশা যাচ্ছেন। রাত্রি, আকাশে চাঁদ। তারা যাচ্ছেন নদীপথে, স্টিমারে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) জাপানের জয়ের খবরে সবাই ওই সময়ে খুশি, এইটুকু দেশ প্রাচ্যের জাপান অতবড় ইউরোপীয় দেশ শাসকের সম্রাটের মাথা হেঁট করে দিয়েছে! এইবার ভারতও জাগবে। দেবব্রত স্বরচিত গান ধরলেন—

'দে মা অসি। / সন্তানে অক্ষম ভেবে, বল আর কত স'বে/
অধোবদনে কেন নীরবে বসি? / দে মা অসি।...'

'...গুরু গুরু দূরে ঐ রণবাদ্য বাজিছে, / মহাকাল ইঙ্গিতে গো মা রণক্ষেত্রে ডাকিছে, / কাল-ই ঐ রণ মাঝে নব যুগে নব সাজে / বাজিবে রুধির পূত ভারতে পশি। / দে মা অসি।'

গাইতে-গাইতে দেবব্রতের দু-গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছিল। দেবব্রত বসুর আর একটি গানও অনেকেই জানেন— 'এসো কে কেঁদেছ নীরবে? / মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে / সে মুখ উজ্জ্বল করিবে?... কে আজ বিপদে না করি দৃক্‌পাত / মৃত্যু নির্যাতন দৈব বজ্রাঘাত / খণ্ড খণ্ড হয়ে মা-র মুখ চেয়ে / এসো কে মারিবে মারিবে?'

দেবব্রত বসুর বোন সুধীরাও বিপ্লবীদের যে নানাভাবে সাহায্য করতেন, একথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঘা যতীনকে আমরা ভুলিনি, তাঁর বুড়িবালামের যুদ্ধও ভোলার নয়। কিন্তু মধ্য কলকাতার মলঙ্গা পাড়ার হাবুকে তো বেমালুম ভুলেছি। অথচ এই হাবুর ব্যবস্থপনায় ২৬ অগস্ট ১৯১৪ লুঠ করা মাউজার পিস্তলের কয়েকটি তো যতীনের সঙ্গীদের কেউ-কেউ ব্যবহার করেছিলেন। বস্তুত, ১৯১৪ আগস্টের পর থেকে বাঙ্গালি বিপ্লবীরা যে ক'টি সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, প্রতিটিতেই মাউজার পিস্তলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এ-কথা ব্রিটিশরাই স্বীকার করেছে তাদের রাওলাট কমিটির রিপোর্টে। হাবুর একটা পোশাকি নাম ছিল—শ্রীশচন্দ্র মিত্র। অতীব দুরন্ত এই যুবকটি যাঁকে গুরুদেব বলত, যাঁর তত্ত্বাবধানে হাবু, শরীরে-মনে বিপ্লবের উপযুক্ত কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠে, তিনি মলঙ্গা পাড়ার অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যার অধিনায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। বিপিনবিহারীর এক বন্ধুর সহযোগিতায় শ্রীশচন্দ্র ওরফে হাবু ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে জে এফ ম্যাডান অ্যান্ড কোম্পানির স্টোর-কিপারের চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে যোগ দেন আর বি রডা অ্যান্ড কোম্পানির পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরিতে। অচিরেই এই করিতকর্মা যুবকটি সাহেবদের নেকনজরে পড়েন তার নির্ভুল কাজের জন্য। ফলে নভেম্বর থেকে তিনি কাস্টমস্ হাউস ক্লার্ক। তার কাজ বিলেত থেকে অস্ত্র আমদানির জন্য ফরমাইশ পাঠান। প্রয়োজনীয় কাগজ এসে পৌঁছলে, বড়সাহেবের কাছ থেকে অন্যান্য কাগজপত্র, টাকা ইত্যাদি নিয়ে কাস্টমস্ অফিসের বড়কর্তা জে বার্নেটের কাছে যেতে হয় ছাড়পত্র নেওয়ার জন্য। এর পরেই হোর মিলার কোম্পানির জেটি থেকে মাল খালাস করিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভ্যান্সিটার্ট রো-তে (ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে), কোম্পানির গুদামে। এইসব ব্যবস্থাপনায় শ্রীশচন্দ্র প্রতিবারই দায়িত্বের পরিচয় দিতেন।

১৯১৪ সালের মার্চ-এপ্রিলে, কোম্পানির বড়কর্তার হুকুম মতো শ্রীশচন্দ্র পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল আর ছেচল্লিশ হাজার টোটার এক ফরমাইশ পাঠান জার্মানিতে; যার পঁয়ত্রিশটি পিস্তল পাঠানো হবে তিব্বতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে। পিস্তলের অর্ডার দিয়ে হাবু সব জানায় অনুকূলচন্দ্রকে। দু-তিনমাস ধরে মূল পরিকল্পনা রচনা করেন তিনজন—শ্রীশচন্দ্র মিত্র, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আঁটোসাঁটো করা হয় সংগঠনকে।

২৬ আগস্ট ১৯১৪, বেলা এগারোটার সময় অন্যান্যবারের মতোই মাল খালাস করাতে অফিস থেকে বেরিয়ে শ্রীশচন্দ্র চলে গেলেন বার্নেটের কাছে। কোম্পানির নামে অস্ত্র এসেছে; মোট ২০২টি প্যাকিং বাক্স। আর সেই বিশেষ অস্ত্র দশ বাক্স, ন-বাক্স টোটা। বাক্সের কাঠগুলি সাদা দেবদারু তক্তার, উচ্চতায় পাঁচফুট। কিন্তু কিসে কী আছে হুট করে বোঝা শক্ত। কোম্পানির নিয়ম, তাই চালানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার অছিলায়, সাহেবের সামনেই কয়েকটি বাক্স খুলে আসল অস্ত্রের বাক্সটিকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি শ্রীশচন্দ্রের। এর পরেই শুল্ক বিভাগের ছাড়পত্রের ওপরেই মালখালাসের জন্য সাহেবের লিখিত নির্দেশ করিয়ে নেন জেটি সরকার মলঙ্গার হাবু; এটি সম্ভব হয় তার সঙ্গে সাহেবের সম্পর্কের জোরে। এর পরেই গুদামের বাইরে গিয়ে পূর্ব পরিচিত দোসাদের গাড়ি সমেত মোট সাতটি বলদ-গাড়ি ডেকে নেন। মাল ওঠানো শুরু হয়। গাড়ি যাবে কোম্পানির গুদামে। ইতিমধ্যে কুলিদের মধ্যে ছদ্মবেশে ভিড়ে গেছে সহযোদ্ধা হরিদাস দত্ত। দোসাদের গাড়ি একেবারে শেষে রাখা— আসল মালগুলি তোলবার জন্য। মোট বইতে-বইতে হরিদাস বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেয় দোসাদের সঙ্গে। অস্ত্র বোঝাই ছ'টি গাড়ি যখন ফটকের দিকে এগোচ্ছে, জেটি সরকার হাবু দৌড়ে এসে দোসাদকে বলে যায়, এই গাড়ি কোম্পানির গুদামে যাবে না, এই হিন্দুস্থানি কুলি (হরিদাস দত্ত) তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ভাড়া দেওয়া হবে পাঁচ আনার জায়গায় আট আনা! গাড়োয়ান দোসাদ তখন নেশায় বিভোর, মাল ওঠাতে আসবার আগে তাকে ভালোবেসে ধেনো মদ খাইয়েছেন অনুকূলচন্দ্র। বলদ-গাড়িতে আসল মালের বাক্স ভরে, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিয়ে গেটের বাইরে চলে যায় দোসাদের গাড়ি। হরিদাস দত্ত যার ছদ্মনাম অতুল, তাকে নিয়ে সোজা এনে ফেলে মলঙ্গা পাড়ায় অনুকূলের কাছে। তারপর হিসাবমতো মাল নামানো এবং দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা। ওদিকে, হাবু দায়িত্ববান কর্মীর মতো কোম্পানির গুদামে মাল খালাসের দেখাশোনা করতে ব্যস্ত। কিছু পরেই, 'আর একটা গাড়ি কোথায়' বলতে-বলতে হাবু বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। মলঙ্গা পাড়ায় গিয়ে অনুকূলচন্দ্রকে সব জানাবার পর নিজের বাড়িতে যায়। জামাকাপড় পালটিয়ে অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে দার্জিলিং মেল ধরে। যাবে রংপুর। কোনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকবার জো নেই, গোয়েন্দাদের জ্বালায়। ঘুরতে-ঘুরতে অসম, তারপরে মণিপুর। জনশ্রুতি, চীনের সীমান্ত পার হতে গিয়ে ওদেশের সান্ত্রীর গুলিতে হাবু নিহত হন। জনশ্রুতিতে কাজ নেই, এটা তো সত্যি, সেই যে কলকাতা ছেড়েছিলেন হাবু, আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার কথাও তো মনে রাখা দরকার।

১৯৫৬ সালে ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা ক্লিমেন্ট রিচার্ড এটলি

কলকাতা আসেন। এই ভদ্রলোকই যখন ওই দেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন (১৯৪৫-১৯৫১), ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দানের ব্রিটিশ সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসে অ্যাটলি সাহেব রাজ্যপালের অতিথি হিসাবে রাজভবনে দু'দিন কাটিয়ে যান। সেই সময়ে রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তী, যিনি আবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, এটলিকে জিজ্ঞাসা করেন, '১৯৪৭ সালের বহু আগেই তো গান্ধীজীর ডাকা ভারত ছাড়ো আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে, ওই সময়ে তো ভারতে এমন কিছু হচ্ছিল না যে, আপনাদের তড়িঘড়ি এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে, তবে গেলেন কেন?'

উত্তরে এটলি অনেক কারণ দেখান, তার মধ্যে যে দু'টি কারণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তার একটি হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির (আইএনএ-র) কর্মকাণ্ড যা নাকি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিটিকে নড়িয়ে দিয়েছে আর অন্যটি রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহ, যা ব্রিটিশকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আর ভারতীয় সেনাদলের ওপর নির্ভর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ওই আন্দোলনের কতটা প্রভাব? এটলির ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে, উনি ধীরলয়ে উচ্চারণ করেন, মি-নি-মা-ল... অর্থাৎ খুবই কম...

এটলির কথায় সত্যতা আছে। দেখা যায়, রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহের খবর পেয়েই তাদের সমর্থনে রয়াল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সও বিদ্রোহ শুরু করে হরতাল ডেকে দেয়। ব্রিটিশরা ভেবেছিল বিদ্রোহী নাবিকদের ওপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে ঠাণ্ডা করে দেবে। সে পথও বন্ধ হয়ে যায়। কোনও কোনও জায়গায় স্থলবাহিনীতেও অসন্তোষ দেখা দেয়। ভারতের যে নৌবিদ্রোহের এমন সর্বপ্লাবী ক্ষমতা তার সম্বন্ধে আমরা জানি কম বা ভাসাভাসা। তার কারণ ওই বিদ্রোহের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। নৌবিদ্রোহে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই এই বিষয়ে লিখেছেন। তবু তাদেরই রচনার নির্ভরে ওই প্লাবন আনা ছ'টি দিনের ইতিহাস পুনর্গঠন করলে এই বিদ্রোহের একটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয় বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ মাত্র, কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে তা বহুগুণ বেড়ে কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছয়। ব্রিটিশ অফিসারদের জোগান নেমে আসায় ভারতীয়রা অনেক বেশি সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে ঢোকবার সুযোগ পান। ফলত, সেনাবাহিনীতে দেশাত্মবোধ ও রাজনীতির অনুপ্রবেশ অনেক বেশি মাত্রায় ঘটতে থাকে। ক্রমশ ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমী অফিসারদের একটি গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে। মেজর জয়পাল সিংহ ছিলেন এর আহ্বায়ক। ১৯৪২-এর জুন মাসে দিল্লিতে এই সংগঠন কমিটির একটি বৈঠক বসে, যাতে গোপন কাজকর্ম চালাবার জন্য এগারো দফা নিয়ম-নীতি ঠিক করা হয়। বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রভাব ছিল অপরিসীম। পাশাপাশি ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তখন ক্রমশ বাড়ছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পঁচিশ লক্ষ সৈনিক ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

সেনাবাহিনীতে যে বিদ্রোহের আয়োজন চলছে, তা ব্রিটিশ প্রথম জানতে পারে চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহের পরে, ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে। দ্বিতীয়বার বিদ্রোহের দিন ঠিক হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪। কিন্তু তার দু-দিন আগে গ্রেপ্তার হন অনুভা সেন এবং তার সহকর্মী মহারাষ্ট্রবাসী ঊর্মিলা বাঈ। এঁরা সর্বভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতে উইমেন্স রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিতে ঢুকেছিলেন। তাঁরা কমল ডোন্ডের নির্দেশমতো কাজকর্ম করতেন। একটা বড় কিছু ঘটতে চলেছে, তা ব্রিটিশ বুঝতে পারল ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ অনুভা সেন-ঊর্মিলা বাঈ গ্রেপ্তারের সময় তাদের হেপাজতে থাকা বিদ্রোহ সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র থেকে। বিদ্রোহের পূর্ণ রূপরেখাটি বোঝার তাড়নায় এই দু'জনের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালান হলো, প্রায় একমাস ধরে। অনুভা সেন নৌবাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের শেষের দিকে, ঊর্মিলা ১৯৪১-এর মাঝামাঝি। অফিসে কেরানির কাজ, নার্সিঙের পাশাপাশি সমিতির জন্য একটি কঠিন কাজ করতেন তারা। তা হলো, অফিসারদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক পাতিয়ে ব্রিটিশ রণসজ্জার খবরাখবর জোগাড়। সবই করতেন নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা ভেবে। ১৯৪৪-এর এই নৌবিদ্রোহ অসফল হবার পর সব বন্দিকে জড়ো করা হলো বোম্বের মুলুন্দ বন্দি শিবিরের ভেতরের খোলা চত্বরে, ৩১ মার্চ ১৯৪৪। দেড়হাজার বন্দির সঙ্গে আছেন অনুভা। প্রত্যক্ষদর্শী ফণিভূষণ ভট্টাচার্য বলছেন, 'তাঁদের (অনুভা-ঊর্মিলা) দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কী-না অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তাঁদের ওপরে। তাঁদের সমস্ত জামাকাপড় রক্তে ভেজা। কোনো কোনো স্থানে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়েও আছে। নিম্নাঙ্গ থেকে পা বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছিল। মুখমণ্ডলের প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছিল বীভৎস কামড়ের চিহ্ন। কোনো কোনো স্থানের মাংসপিণ্ড ছিঁড়েও গিয়েছিল। তা দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছিল। তাঁদের সুন্দর সুঠাম দেহের ওপরে পড়েছে নীল ছাপ। তবুও কিন্তু তাঁদের প্রখর দৃষ্টির মধ্যে একটা অনির্বচনীয় বজ্র-দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল এবং তা ধরাও পড়ল তাঁদের উচ্চরবের ধ্বনির মধ্যে—'ভারতের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে পড়ে শোনালেন কোর্ট মার্শালের রায়। সারমর্ম হলো, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাজকে উচ্ছেদ করবার গভীর চক্রান্তে যুক্ত থাকবার অপরাধে তরুণী দু'জনকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং দেড় হাজার বিদ্রোহীকে ভোগ করতে হবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। যেতে হবে মূলতান (এখন পাকিস্তানে) সামরিক কারাগারে। রায় পাঠ করে শোনাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অ্যাকশন। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁন করানো হলো মহিলা দু'জনকে। দু-জন মহিলাকে মারতে ধার্য হলো চারজন গোরা সৈন্য। তারা ট্রিগার টেপবার আগে অনুভা-ঊর্মিলা উচ্চারণ করলেন—আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, জয় হিন্দ। তারপরেই চাঁদমারির দেওয়ালে লুটিয়ে পড়ল তাদের রক্তাক্ত দেহ।

আশি ছুঁতে চলা আমাদের স্বাধীনতার উদ্‌যাপনে এইসব বিস্মৃত যোদ্ধাদের স্মরণে একটি করে আকাশপ্রদীপ জ্বালাতে পারি না আমরা?

বাংলাদেশের হিন্দু, হিন্দুর বাংলা দ্বেষ

প্রকাশ দাশ কশ্যপ

আগে ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ ছিল। মোচড়মান তাদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ দখল করে নিল! এখন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরাতে যে ভাবে বাংলাদেশি মোচড়মান অনুপ্রবেশ করছে তাতে মনে হয় আগামী কয়েক বছরে এই রাজ্যগুলিও হিন্দুদের হাতছাড়া হবে। যুদ্ধ করে নয়, জনসংখ্যার দিক দিয়ে দখল নেবে। গত এক বছরে নো বেল ইউনুস এর শাসনে বাংলাদেশটা হিন্দুদের কাছে জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। গত এক মাসে বাংলাদেশে নিহত হওয়া কয়েকটি নাম হলো— অমৃত মণ্ডল, খোকন দাস, মণি চক্রবর্তী, রানাপ্রতাপ, রিয়া গোপ, দীপ্ত দে, হৃদয় চন্দ্র তারোয়া, রিপনচন্দ্র শীল, রথীন বিশ্বাস, রুদ্র সেন, শুভ শীল, তনয়চন্দ্র দাস, সৈকত চন্দ্র দে, দীপুচন্দ্র দাস। নামগুলো কি পরিচিত? এরা সবাই বাংলাদেশি হিন্দু। অমি সংখ্যালঘু বলতে নারাজ। প্যাটার্ন যেটা এটাকে আমি এথনিক ক্লিনজিং-ই বলব। বাংলাদেশে যেটা চলছে সেটা গণহত্যাই। অনেকটা পাকিস্তানের মডেল ফলো করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সকল হিন্দুকেই জাস্ট মেরে ফেলা হবে। কিছু জাস্ট শোপিস হিসেবেই রাখা হবে। তাদেরকে না বের হতে দেওয়া হবে, না দেশের বাইরে যেতে দেওয়া হবে। প্ল্যানিং করেই এটা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যেটা চলছে সোজা কথায় হিন্দু নিধন চলছে।

হিন্দুরা দেশ ভিটে মাটি কখন ছাড়ে? যখন হিন্দুর মা-বোনের উপর আঘাত আসে। এমনই এক হৃদয় বিদারক ঘটনা কুমিল্লার মুরাদনগর। 'আজ মুরাদনগর কাল সকল হিন্দুর ঘর।' ধিক এই সমাজকে! কুমিল্লার মুরাদনগরে এক হিন্দু নারীকে ঘরের দরজা ভেঙে প্রথমে দলগত বলাৎকার এবং পরে সেই বিবস্ত্র নারীর পাশবিকতার দৃশ্য ভিডিয়ো করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা আমাদের মানবতা, বিবেক ও সভ্যতা নিয়ে গভীর সংকটের বার্তা দেয়। এটা কেবল একটি নারীর ওপর নিষ্ঠুরতা নয়— এ এক গোটা সমাজের মুখে চপেটাঘাত। আমাদের নৈতিকতা ও আইনের শাসনের উপর নির্মম আঘাত। এ ঘটনা নিছক 'অপরাধ' নয়, এটি একটি পৈশাচিক বার্তা— এই দেশে নারীর শারীরিক নিরাপত্তা, হিন্দুদের মর্যাদা ও মানবাধিকারের কোনো গ্যারান্টি নেই।

প্রশ্ন জাগে, আমরা কেমন সমাজ গড়েছি, যেখানে এমন বিকৃত উল্লাসে বলাৎকারের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়, অথচ প্রতিবাদে রাজপথ মুখর হয় না? কেমন দেশ চালাই আমরা, যেখানে হিন্দু নারীকে টার্গেট করে যৌন নিপীড়ন চালিয়ে তাকে একেবারে নিঃস্ব করা যায়— একবার শরীরের, আরেকবার সম্মানের? এ কোন দেশে আমরা বাস করছি? আর কতকাল আমরা একটা সুন্দর স্বদেশের জন্য অপেক্ষা করব? আর কোনো ফেরেস্তাকে ক্ষমতায় বসাব? কেবলই ধিক্কার আর ধিক্কার! কেবলই হৃদয়ে রক্তক্ষরণ!

এসব ঘটনার খবর মূলধারার সংবাদমাধ্যমে আসেনি। 'সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা'র দেশে হয়তো আসবেও না! নাগরিক সমাজ ও শাসকের এতটুকু বিকার নেই। যেন কিছুই ঘটেনি। এই ঘটনার নিন্দা জানানো যথেষ্ট নয়। তার ভাষাও নেই। সময় এসেছে ঘৃণা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদকে জোরালো ও কার্যকর আন্দোলনে পরিণত করার।

যারা এই পাশবিকতার নায়ক, তারা যেন কোনোভাবেই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে না পারে। আইনি প্রক্রিয়ার নামে দীর্ঘসূত্রিতা এবং অপরাধীদের রক্ষাকবচ তৈরি করে কোনোভাবেই তাদের রক্ষা করা যাবে না। ন্যায়বিচার শুধু হতে হবে না, সেটি হতে হবে দ্রুত, দৃশ্যমান ও দৃষ্টান্তমূলক।

ব্যাপারটা শুধু অপরাধীদের শাস্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে থাকা নীরবতা, প্রশাসনের উদাসীনতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ছায়ায় বেড়ে ওঠা ধর্ষক-সন্ত্রাসীদের লালন-পালন— সবকিছুই এই বর্বরতার জন্ম দেয়। যখন সমাজ নীরব থাকে, শাসক দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, তখনই জন্ম নেয় এমন দানব। তাই দায় আমাদের সবার। আজ যদি আমরা নীরব থাকি, কাল সেই পাশবিকতার শিকার হতে পারে আমাদের কেউ— আমাদের মা, বোন, মেয়ে, প্রতিবেশী, সহকর্মী। এই দেশে প্রতিটি নারীর, প্রতিটি হিন্দু, প্রতিটি মানুষ নিরাপদে বাঁচার অধিকার রাখে। সেই অধিকারের প্রশ্নেই আজ সোচ্চার হওয়া জরুরি। এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠ হোক এক, আমাদের অবস্থান হোক অনড়, আমাদের প্রতিরোধ হোক অবিচল। এখানেই শেষ নয়। সমান তালে চলছে জমি বাড়ি দখল, লুঠ, অগ্নিসংযোগ। আগুনে শুধুমাত্র আবাস নয়, জীবন্ত মানুষও পুড়ছে।

প্রথমে দীপুচন্দ্র দাসকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তাও জীবন্ত অবস্থায়। তারপর? শরিয়তপুরের খোকন দাসকে আগুনে পুড়িয়ে... তারপর? হোসেনডাঙার অমৃত মণ্ডলকে অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে... তারপর? ময়মনসিংহের ভালুকায় ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসকে-দাদা একটু গুলি করে দেই? বলেই সহকর্মী নোমান মিয়াঁ একেবারে গুলি করেই দিল।

তারপর? নরসিংদির মণি চক্রবর্তী আর প্রাণতোষ সরকার। তারপর? যশোরের রানা প্রতাপ বৈরাগীকে গুলি করে... তারপর? চরসিন্ধুর শরৎমণিকে কুপিয়ে। তারপর? ঝিনাইদহের হিন্দু বিধবাকে বলাৎকার করে চুল কেটে গাছে বেঁধে প্রহার। তারপর? শ্রাবন্তী ঘোষ, বয়স-১২ বছর, বলাৎকার করে গলা টিপে হত্যা, স্থান— চট্টগ্রাম, গত রবিবারের ঘটনা... তারপর? হবিগঞ্জের কামদেব দাসকে জলে ডুবিয়ে... তারপর? নওগাঁর মিঠুন সরকারকে ধাওয়া করে খালে ডুবিয়ে... তারপর? পীরগঞ্জের ধনেশ্বর বর্মণের জমি কেড়ে নেওয়া হলো প্রকাশ্যে।

তারপর? লক্ষ্মীপুরে সত্যরঞ্জন দাসের পাকা ধান পুড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর? কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসনে কর্মরত অন্নপূর্ণা দেবনাথের উপর হামলা তারপর? শুভ পোদ্দারের দোকান থেকে তিরিশ ভরি সোনা ছিনতাই। তারপর? আরও কয়েকটা জিনিস জেনে রাখুন সাতটা গুলি শরীরে নেওয়ার আগে রানা প্রতাপ বৈরাগীকে বেঁচে থাকার জন্য কর দিতে হতো।

বরফ কলের মালিককে তিন লক্ষ টাকা প্রোটেকশন মানি দিতে হতো। একে কি বলে জানেন? জিজিয়া। আরবি হানাদারদের জিনবহনকারী কনভার্টেডগুলো জিজিয়া টিকিয়ে রেখেছে। জিজিয়া দিয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁচা যাচ্ছে না। এছাড়াও অসংখ্য মহিলার সম্মানহানি করা হচ্ছে যারা ভয়ে অভিযোগ করছেন না। যেগুলো উপরে লেখা হলো সেগুলো সংবাদমাধ্যমের খবর। একদিন এই লেখকও মরে যাবে। আমরা কিছুই করব না? শুধুমাত্র খবর ফেসপুক পোস্ট। সংকল্প নিন একের বদলে একশো তবে হবে শান্তি। নতুবা হিন্দুশূন্য বাংলাদেশে মিত্রতা কার সঙ্গে? □

কমিউনিস্টদের ভণ্ডামি ধরে ফেলেছে মানুষ

শ্যামলকান্তি মজুমদার

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বামপন্থীদের প্রতিবাদ চোখে পড়লো আমেরিকার বিরুদ্ধে কলকাতায় রাস্তায়। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতিকে আমেরিকা ধরে নিয়ে গেছে তার প্রতিবাদে মিছিল। কিন্তু নিকোলাস মাদুরো তো ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক। তাহলে তারা একজন স্বৈরশাসকের মুক্তির জন্য রাস্তা কাঁপিয়ে চিৎকার করছে কেন? দ্বিতীয়ত, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতিকে আমেরিকা বিনা বাধায় নিয়ে গেল কী করে? ভেনেজুয়েলার আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স ও রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীরা কোথায় ছিল? ওরা কেন কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারল না?

এক সময়ের লাতিন আমেরিকার অন্যতম সবচেয়ে ধনী দেশ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারি ছিল ভেনেজুয়েলা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অয়েল রিজার্ভ এবং গোল্ড রিজার্ভ এই ভেনেজুয়েলায়। পৃথিবীর চতুর্থ ইকোনমি ছিল এই দেশ। সময়ের আবর্তনে, ১৯৯৮ সাল থেকে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক পথে চলতে শুরু করে দেশটি। আসে সোশ্যালিস্ট ডিক্টেটরশিপ। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশটির মুদ্রা কার্যত মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। দু' কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। অনেক শহরে এটিএম খালি রয়েছে, বেশিরভাগ মানুষের দু'বেলা খাওয়া জোটে না। দিনে আট-দশ ঘণ্টার বেশি কেউ বিদ্যুৎ আশা করে না। চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে এবং ১০ জনের মধ্যে নয়জন তাদের দৈনন্দিন খাবার কেনার টাকা ব্যবস্থা করতে পারে না। নিজের ও পরিবারের জীবন বাঁচাতে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ তথা দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে নিজেদের সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে পার্শ্ববর্তী ১৩টি দেশে। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, বিচারবহির্ভূত মৃত্যুদণ্ড, নির্যাতন, খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি। এক কথায় দেশটির ধ্বংস করে দিয়েছে কমরেডরা। প্রেসিডেন্টের এই বর্বরতা চীনের মাও-সে-তুং, রাশিয়ার স্তালিন, কম্বোডিয়ান পল পট-এর থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। অবশ্য এর কিছু অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গেরও আছে। পশ্চিমবঙ্গের লোকরা দেখেছেন কী করে উত্তরে নৈহাটি হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীববর্তী কলকারখানা যে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হতো, দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে লাল ঝান্ডার দলগুলি তাতে লালবাতি জ্বালিয়ে স্থানীয় মানুষকে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত করেছে।

কমিউনিস্টদের এইসব অপকর্মের সুযোগটা নিয়েছে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতিকে তারা বিনা বাধায় ধরে নিয়ে চলে গেছে নিজের দেশে। দেশের লোক কতটা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হলে সেনাবাহিনী তথা দেহ রক্ষীরা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে অন্যদেশের হাতে তুলে দেয় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে! মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যা কিছু রেসিসটেন্স দাঁড় করিয়ে ছিল কিউবান সৈন্যরা যা কিউবার মতো অন্য একটি কমিউনিস্ট দেশের পক্ষ থেকে তাদের রাষ্ট্রপতির সুরক্ষার জন্য আত্মনিয়োগের উদাহরণ। এই সমস্ত বর্বরতার ইতিহাস থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে নেওয়ার জন্য কলকাতায় বুকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন কমরেডরা। যাতে মানুষ বিষাক্ত সমাজতান্ত্রিক নেতা মাদুরোর কথা না বলে সাম্রাজ্যবাদী ট্রাম্পের কথাই বলে এবং সেটাই হচ্ছে। এখানেই বামপন্থীদের সাময়িক বিজয় হলেও চির অবক্ষয় থেকে কে রক্ষা করবে?

ঘুরে আসছি পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের কথায়। কেউ বলতে পারবেন ভারত থেকে ১৩০০০-১৫০০০ কিলোমিটার দূরে এক হত্যাকারী রাষ্ট্রপতিকে ধরে নেওয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কী সম্পর্ক হতে পারে, যেখানে বেশিরভাগ সাধারণ লোক বিভিন্ন লক্ষ্মীশ্রী, ভাগ্যশ্রী-র ওপর নির্ভরশীল? সত্য সত্যই যদি বামপন্থীরা গরিব, দুঃখী, মেহনতি, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হতো, তাহলে বর্তমান বাংলাদেশের ঘটনা সমূহতে ওরা দেড় বছর ধরে নীরব, নির্জীব, মুখ বধির হয়ে থাকতে পারত? যেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত গরিব মানুষকে হত্যা, খুন, আগুন দিয়ে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে লাইভ টেলিকাস্ট করা, ঘরে বন্দি করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, হিন্দু মা-বোনেদের ধর্ষণ করে হত্যা করা, শিশুদের ধর্ষণ করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া, মেহনতি মানুষের ভিটে ছাড়া করা, কলকারখানায় আগুন লাগিয়ে শ্রমজীবীদের আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া তথা অনাহারে অর্ধাহারে থাকাতে বাধ্য করা ইত্যাদি নিত্যদিনের ঘটনা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারত? তাছাড়া বাংলাদেশে প্রতিদিন শতসহস্র নতুন নতুন ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং এইসব বর্বর, অসভ্য, নৃশংস, ঘটনাগুলো পুরো পৃথিবীকে ব্যথিত করছে, কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের বামপন্থী দলগুলো গরিব শ্রমিকদের আর্তনাদ, গ্রামের গরিব দুঃখী মানুষের গগনভেদী চিৎকার, সমগ্র পৃথিবীকে অনবরত ব্যথিত করে চলছে কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের তথা বামপন্থীদের কোনো হেলদোল নেই। যদিও আজ যারা যুবা বামপন্থী এদের অনেকের বাবা, মা, দাদু, দিদা-সহ বয়োজ্যেষ্ঠরা এইরকম হিংসায় কারণে এই দেশে খালি হাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। বামপন্থীদের সময় হলো না অন্তত একবার মিছিল বের করে প্রতিবাদ করতে গত দেড় বছরে। অথচ হাজার হাজার মাইল দূরের দুরাচারী রাষ্ট্রপতির মন প্রাণ কেঁদে উঠে তাদের মনে পড়লো আরেক নর্থ আমেরিকার দেশ কিউবার কথা। আশির দশকে বাস্তুহারা, হতদরিদ্র, হিন্দু বাঙ্গালিদের রক্ত বিক্রি করে জাহাজে করে চাল, ডাল, তেল পাঠিয়ে ছিলেন এই বামপন্থীরা কিউবার জন্য এবং এই শরণার্থীদের ভোটের সাহায্যও নিয়েছিল ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬০)

গোরক্ষা-সত্যাগ্রহ-কারাবরণ

সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাক্তাজী আপ্পাজী যোশী, দাদারাও পরমার্থ ও নারায়ণরাও দেশপাণ্ডে প্রমুখ প্রায় বারো-চৌদ্দ জন সত্যাগ্রহী-সহ পুসদে এসে পৌঁছান। সেখানকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আলোচনা করে স্থির করে যে, লোকমান্য অণের নেতৃত্বে এখানে সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে, ডাক্তারজীর নেতৃত্বে ইয়তমলের মতো একটা মুখ্য স্থানে সত্যাগ্রহ হলে ভালো হয়। পাঁচ-ছ'দিন বাকি থাকায় ডাক্তারজী এদিক-ওদিক প্রচার কাজে লেগে গেলেন। জেলে দেখা করে এলেন লোকনায়ক অণের সঙ্গে। এর মাঝেই একদিন এক ঘটনা ঘটলো।

সেদিন ডাক্তারজী ভোরবেলা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নদী থেকে যখন ফিরছিলেন— দেখলেন দুজন মুসলমান একটি হৃষ্টপুষ্ট গোরু নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলবশত ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন— 'গোরু কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' তারা উত্তরে বলল— 'যাচ্ছি না কোথাও, একটু পরেই এখানে আমরা একে কুরবানি দেব'। হিন্দু বসতির মধ্যে এভাবে খোলা জায়গায় গোহত্যার কথা শুনে ডাক্তারজী যেমন স্তম্ভিত তেমনই ক্রুদ্ধও হলেন। তিনি জানতে চাইলেন— 'গোরুর দাম কত?' বারো টাকায় কেনার কথা বললেও তারা বিক্রি করতে না চেয়ে মাংস বিক্রি করে ব্যবসা বজায় রাখতে চাইলো। ইতিমধ্যে বুড়ো কসাইও হাজির হলো, জানাল বহু বছর ধরে এখানে গোরু কেটে তারা মাংস বিক্রি করে। ডাক্তারজী বললেন— 'মাংস বিক্রি করে যে টাকা পাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি— একে মারবে না'। তাদের হিসেবের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা ডাক্তারজী দিতে রাজি হলেও তারা তখনই গোরুটি কাটবে বলে ঘোষণা করল। এবার ডাক্তারজী নিজ মূর্তি ধারণ করলেন— মুহূর্তে গোরুর দড়ি হাতে নিয়ে কঠোর ভাবে বললেন— 'আমার প্রাণ থাকতে একে হত্যা করতে পারবে না'। এমন উগ্রমূর্তি দেখে তারা মুসলমান গ্রামে গিয়ে কয়েকজন মুসলমানকে ডেকে নিয়ে এল। তারা ডাক্তারজীকে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাক্তারজী টাকার বিনিময়ে গোরুর অধিকার নেওয়ার বিষয়ে অনড় রইলেন। একজন তার মতো সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করলেন— 'আপনারা জঙ্গল সত্যাগ্রহ করতে এসেছেন, এসব ফালতু ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন কেন?' শুনে ডাক্তারজী রেগে গেলেন— 'হিন্দুদের পূজ্য গোরুকে রক্ষা করা ফালতু ব্যাপার? জঙ্গল সত্যাগ্রহ বা গোরুর জন্য সত্যাগ্রহ করা দুটোই আমার কাছে সমান। ইতিমধ্যে পুলিশ অফিসার হাজির এবং কোনো সমাধান না হওয়ায় তিনি যখন বললেন— 'তাহলে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করছি'। শুনে ডাক্তারজী নির্বিকার থাকলেও মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গোরুটি টাকা দিয়ে কিনে ডাক্তারজী স্থানীয় গোরক্ষক সংস্থার হাতে সেটি তুলে দিলেন। এই ঘটনায় ডাক্তারজীর দেশভক্তির প্রশংসা করতে লাগলো সকলে, সভাগুলিতে উপচে পড়তে লাগলো ভিড়।

সত্যাগ্রহের দিন একুশে জুলাই ভোর সাড়ে ছ'টায় কয়েক হাজার মানুষের শোভাযাত্রা মাঠে ধ্বজ বন্দনা সেরে জঙ্গলের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওনা হলো। জঙ্গলের আইন ভাঙতে সত্যাগ্রহীদের সকলের হাতে কাস্তে দেওয়া হলো, নেতৃত্বে থাকার জন্য ডাক্তারজীর হাতে দেওয়া হলো রুপোর কাস্তে। ইয়তমল থেকে জঙ্গলের এই সত্যাগ্রহ স্থান ছিল পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। লোহারা জঙ্গলের পাশে ধামনগাও গ্রাম। প্রায় হাজার দশেক মানুষ এই সত্যাগ্রহ দেখার জন্য হাজির হয়েছিল। পুলিশ অফিসাররা আগে থেকেই তৈরিই ছিল। জঙ্গলে ঘাস কাটার চেষ্টা করতেই অফিসার সবাইকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা করলেন। গ্রেপ্তারের পরে আদালতে বিচারে রায়ে বিচারক ডাক্তারজীকে দুটি ধারায় ছ' মাস ও তিন মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিলেন। অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের জন্য চার মাস করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। বিচারপতির রায় দানের পর পুলিশ প্রহরায় ডাক্তারজী-সহ সব সত্যাগ্রহীকে পৌঁছে দেওয়া হলো অকোলা কারাগারে। শুরু হলো নতুন কারাবাসজীবন।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

मध्यप्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि का द्वार

देश का सबसे बड़ा

'पीएम मित्र' पार्क

धार, मध्यप्रदेश

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5F विज़न

फार्म टू फाइबर । फाइबर टू फैक्ट्री । फैक्ट्री टू फैशन । फैशन टू फॉरेन

कम्पलीट वैल्यू चेन @ वन डेस्टिनेशन

कताई से लेकर सिलाई तक पूरी प्रक्रिया के लिये एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क

पार्क क्षेत्र - 2,158 एकड़

₹ 20 हजार करोड़ का निवेश सुनिश्चित

3 लाख लोगों को रोज़गार

टेक्सटाइल के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठित 91 कंपनियों को निवेश प्रस्ताव के अनुरूप भूमि आवंटित

फार्म से फॉरेन तक मध्यप्रदेश का वस्त्र उद्योग

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

अन्नदाता

मध्यप्रदेश शासन

पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं

उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति

मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री — नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ये विकल्प अपनाएं

हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी

रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी

बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं

धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग

प्राकृतिक खेती को अपनाएं

मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि

रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति

प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी

जनसंपर्क - मध्यप्रदेश शासन/2025

आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....